৪৬০৭

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় ভাগ।

(১৩০৮ সালের কার্ত্তিক হইতে ১৩০৯ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত।)

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি,এ,

সম্পাদিত।

কীর্ণাহারের স্বদেশ-হিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু
সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের যত্নে ও
ব্যয়ে কীর্ণাহার গ্রাম
হইতে
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৩০/৫ মদনমিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত।
১৩০৯

সূচী।

	বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
১।	অঞ্জলি।	(শ্রীতারকনাথ সরকার)	১১৫
২।	আত্মসমর্পণ।	(শ্রীসৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এস্‌মাইল হোসেন সিরাজি) ...	৩৭০
৩।	আধ্যাত্মিক জ্ঞান।	শ্রীশশিভূষণ রায়, বি এ,)	৩৭
৪।	ঈশ্বর সমস্যালোচন।	(শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার)	২০৭
৫।	উদাস প্রাণ।	শ্রীঃ—	২১৫
৬।	কত আর সই ?	(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)	১৭২
৭।	কলিকাল।	(শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়)	৫৪, ৯৭
৮।	কেন ?	(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)	৪৩
৯।	কোথা তুমি ?	(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)	২৫২
১০।	গুরু ও শিষ্য।	(শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়)	২১৭
১১।	গ্রন্থ সমালোচনা।	(সম্পাদক)	১৯৫
১২।	চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী।	... ...	১, ৮৩, ১৬৬
১৩।	জালপ্রতাপ চাঁদ।	(সম্পাদক) ...	১৩০, ১৫৬, ১৮২, ২৩৩, ২৮৮
১৪।	জ্যোতিষ্ক তত্ত্ব।	(শ্রীআদ্যনাথ রায়, বি, এ,)	১৪৭
১৫।	ত্রেতা ও দ্বাপরের গ্রন্থালোচন।	(শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার) ...	১৫৩
১৬।	তান্ত্রিক সাধনার ক্রমনির্দ্দেশ।	(শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়) ...	২৩৯
১৭।	দুঃখ।	(শ্রীশশিভূষণ রায়, বি-এ,)	২৬৪
১৮।	দেবস্থান——কংকালিতলা।	... ...	৩৪৬
১৯।	নাগের সমাধি।	(শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী)	১৭৫
২০।	নূতন বৈষ্ণব কবিগণ।	(শ্রীআবদুল করিম)...	১৪৬
২১।	নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ।	(শ্রীআবদুল করিম)	২৭১
২২।	ন্যায়শাস্ত্র—ভাষা পরিচ্ছেদ।	(শ্রীশশিভূষণ রায়, বি, এ,)	১২৭
২৩।	পল্লীসমাজ।	(সম্পাদক)	৫৯, ৭১
২৪।	প্রবাদ প্রসঙ্গ।	(শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল)	৬৫, ১১৬, ২৫৫
২৫।	বিস্মৃতির কূলে।	(শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার)	২৫৪
২৬।	ভুল।	(শ্রীমহম্মদ আজিজ উস্‌সোভান)	৪৪
২৭।	রঙ্গলাল বাবুর গান।	(শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাভূষণ)	৩৫২
২৮।	রাধা।	(শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)	৩৫৪
২৯।	ভূষণ্ডী রামায়ণ।	... ...	৩১৭
৩০।	মায়া ফাঁদ।	(শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায়)	১৮০

	বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
৩১।	মীরজাফর খাঁ।	(শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)	... ৫১, ২৮২
৩২।	মেয়েলী মনসা।	(শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী)	... ২৯৬
৩৩।	যোগী।	(শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায়)	... ২১৬
৩৪।	লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়।	(শ্রীআবদুল করিম)	... ৬৯
৩৫।	বিদায়ের দিনে।	(শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার) ...	... ১৭৪
৩৬।	শাস্ত্রোক্ত বলিদান-রহস্য।	(শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়) ...	... ৩০৩
৩৭।	শিল্প।	(শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল)	... ৪৫
৩৮।	শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।	(শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী) ...	১১৩, ২০৫
৩৯।	সমালোচনা।	(সম্পাদক)	১৬০, ৩০০
৪০।	সাধুর লক্ষণ।	(শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়)	... ১৪৩
৪১।	স্বপনে।	(শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)	... ১১৬
৪২।	সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	(শ্রীশশিভূষণ রায় বি-এ,) ...	৩৫৬

৫০৪/১

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় ভাগ] পৌষ, ১৩০৮। [৩য় সংখ্যা।

প্রবাদ প্রসঙ্গ।

কিছু দিবস হইল আমি আমাদের দেশে ও পুস্তকাদিতে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই ও কিয়ৎ পরিমাণে কৃত-কার্য্যও হইয়াছি। অদ্যাবধি আমি প্রায় সহস্রাধিক প্রবাদ বাক্য সংগ্রহ করিয়াছি। সেগুলি "উৎসাহ" পত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবচন ও প্রবাদে পার্থক্য আছে। প্রবচন প্রবাদ হইতে পারে, কিন্তু সকল প্রবচনই প্রবাদ নহে। বড় বড় পণ্ডিতগণ লোক শিক্ষার্থ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রবচন এবং কোন ঘটনা উপলক্ষ করিয়া যে কথার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই প্রবাদ। প্রবাদ এবং প্রবচনের মধ্যে আর একটু পার্থক্য এই যে, প্রবাদ সাধারণতঃ সকল শ্রেণীর লোকের নিকটেই পরিচিত, কিন্তু প্রবচন কেবল শিক্ষিত সমাজে সীমাবদ্ধ।

ছেলে ভুলানো ছড়াকেও প্রবাদ কহে না। কেহ কেহ—

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোরাডুম সাজে।
ডাহিন্‌মেড়া ঘাগর বাজে ॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে লাগলো ঠুলি।
কে কে যাবি কম্‌লা ফুলি ॥
কমলা ফুলির বিয়েটা।
সূর্য্যি মামার টিয়েটা ॥
আয়রে কমলা হাটে যাই।
পান গুয়োটা কিনে খাই ॥
কচি কুম্‌ড়ার ঝোল।
ওরে জামাই গা তোল।

ISSUE(S) MISSING

প্রভৃতি ছড়াকে প্রবাদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

"বীরভূমি" পত্রিকায় কয়েকবার শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় প্রবাদ বাক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি যে শ্রেণীর বাক্যকে প্রবাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন, আমরা তাহাকে প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। মিত্রজা মহাশয় "অর্জ্জুন রায়" "ঘনশ্যাম গোস্বামী" "ছকু বিদ্যা-বাগীশ" প্রভৃতি শব্দকে প্রবাদ নামে প্রচার করিতেছেন। আমাদের কিন্তু লেখকের সহিত কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। লেখক যদি এই রকম কথা-কেই প্রবাদ নামে প্রকাশ করিতে থাকেন, তবে তাঁহার প্রবাদবাক্যের মূল উদ্ধারের চেষ্টা না করিলে ক্ষতি নাই। আর তাঁহার যদি কেবল বীরভূম জেলায় প্রচলিত ছড়া, প্রচলিত কথা প্রভৃতির মূল উদ্ধার করাই অভিপ্রেত হয়, তবে আমাদের কোন আপত্তি নাই,—তিনি "প্রবাদ প্রসঙ্গ" শিরো-নামটি পরিবর্ত্তন করিলেই সুখী হইব।

"বীরভূমির" পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত আমি পাঁচটি প্রবাদ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

নরাণাং মাতুলক্রমঃ।

ছেলেদের কোন সদ্‌গুণ দেখিলে লোকে বলিয়া থাকে—

বাপ্‌কো বেটা, (১)

আর যদি দোষ দেখিতে পায়, অমনি বলিয়া উঠে—

নরাণাং মাতুলক্রমঃ

যেন মাতুলের দোষেই ছেলে খারাপ হইয়াছে।

একদা কর্ণ শল্যকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন,—

গোরক্ষঃ সহদেবশ্চ নকুলো হয় রক্ষকঃ।
বৈরাটে কুরুদায়াদৌ নরাণাং মাতুলক্রমঃ॥ (২)

হে শল্য! বিরাটভূমে পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাত বাস কালে, যদিও তাঁহা-দিগকে সেবা ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে হইয়াছিল, তত্রাচ যুধিষ্ঠির-প্রমুখ জ্যেষ্ঠত্রয় মহৎকার্য্যই সম্পাদন করিয়াছিল। কিন্তু নকুল ও সহদেব কুরুবংশে জন্ম

(১) বাপ্‌কে বেটা, সিপাহীকো ঘোড়া, কুচনহিত থোড়া থোড়া॥

(২) জৈমিনী ভারত।

পরিগ্রহ করিয়াও অশ্বপালন রূপ যে নীচ কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের দোষ নহে, তোমার দোষ, কারণ মনুষ্যের সকল দোষ মাতুলের ক্রমানুসারেই হয়।

বিষস্য বিষমৌষধম্।

(বিষে বিষ নির্বিষ।)

মহাকবি কালিদাস একদা উজ্জয়িনীর রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে পথ পার্শ্বস্থিত এক দ্বিতল প্রাসাদোপরি একটি অর্দ্ধ অবগুণ্ঠণবতী ষোড়শী যুবতীকে দেখিতে পাইলেন। কালিদাস রমণীর অলৌকিক রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া বারবার তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দর্শনে যুবতী লজ্জিতা হইয়া প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। যাইবার সময় একবার তাঁহার প্রতি তীব্র কটাক্ষ ক্ষেপ করিয়া গেল। কালিদাস যুবতীর কটাক্ষ-বাণে জর্জ্জরিত হইয়া এবং অদর্শনে উদ্ভ্রান্ত চিত্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে কমলায়ত লোচনে।
শ্রূয়তেহি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম্॥ (৩)

অয়ি মৃগলোচনে! তুমি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াছ, আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আমাকে শীতল কর। কারণ কথিত আছে, বিষই বিষের ঔষধ!

গোণ্ডায় আণ্ডা।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, পাঠশালার একজন ছাত্র কড়া গোণ্ডা প্রথমে হাঁকিয়া বলে। অবশিষ্ট ছাত্রবৃন্দ তাহার প্রতিধ্বনি করে মাত্র। কড়া গোণ্ডা পড়া হইলে ছুটি হয়। কাজেই সে সময় ছেলেদের মন বাড়ীর দিকে ধাবিত হয়। প্রথম জন বলিল—চার কড়া এক গোণ্ডা। অবশিষ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে একজন তালপাতার তাড়া বাঁধিতে বাঁধিতে শুধু চলিল 'একগোণ্ডা' আর একজন পুস্তকের দপ্তর নাড়িতে নাড়িতে বলিল—'গোণ্ডা' আবার কেহবা প্রতিবাসী ছাত্রের সহিত মারামারি করিতে করিতে সুর করিয়া বলিয়া বসিল,—'আণ্ডা'। ইহাকেই বলে 'গোণ্ডায় আণ্ডা'। সেইরূপ—

গোলে হরিবোল।

মৃতব্যক্তির সৎকারার্থ শ্মশানে গমন কালে একব্যক্তি 'হরিবোল' বলে।

(৩) শৃঙ্গার তিলক।

অপরগুলির মধ্যে কেহ 'বোল' কেহবা 'ওল' বলিয়াই সারে। কিন্তু সকলের উদ্দেশ্যই হরিবোল বলা।

লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

কলিকাতা মহানগরীতে গৌরীসেন নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এমনি দাতা ছিলেন যে, পথ দিয়া যাইতেছেন একজন আসিয়া বলিল, "দেনার জন্য আমার ঘর বাড়ী নিলাম হইয়া যাইতেছে"। গৌরীসেন যাইয়া তাহার দেনা পরিশোধ করিয়া দিলেন। বিচারালয়ে কাহারও জরিমানার হুকুম হইয়াছে, তাহার নিজে টাকা দিবার সামর্থ্য নাই, গৌরীসেনকে যাইয়া ধরিল, গৌরীসেন তৎক্ষণাৎ অর্থ দিয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন। বাজার হইতে ইতর লোকে গৌরীসেনের নাম করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া যাইত, দোকানী গৌরীসেনের নিকট উপস্থিত হইলেই মূল্য পাইত। একদা একদল ইয়ার মদের দোকানে যাইয়া মদ্য পান করে। পান করিয়া আসিবার কালে মদওয়ালা টাকা চাহিলে, তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠে,—

লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

বকঃ ধার্ম্মিকঃ।

সর্ব্বপ্রকার অসৎকর্ম্মে লিপ্ত কোন লোককে যখন আমরা বাহ্যিক সততা প্রদর্শন করিতে দেখি, তখন আমরা "বকঃ ধার্ম্মিকঃ" বলিয়া থাকি। কিন্তু অনেকেই এতৎসংসৃষ্ট গল্পটি জানেননা।

একদা ভগবান রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের সহিত পম্পাসরোবরতীরে পরিভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন, তীরে কতকগুলি বক অতি সন্তর্পণে কূলে বিচরণ করিতেছে, পাছে কোন কীট পতঙ্গ তাহাদের পদ নিম্নে পড়িয়া মারা যায়, যেন বক মহাশয়দের তাহাই আশঙ্কা। কিন্তু উহাদিগের প্রকৃত অভিপ্রায় কীট পতঙ্গাদি ধরিয়া উদর পূর্ণ করা। রামচন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া উহাদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণিনাম্বধ শঙ্কয়া।
পশ্যলক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

"লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়।"

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি প্রধান দোষ এই যে, ইহা অস্থি পল্লবিত ও নবীনত্ব শূন্য। আবহমান কালাবধি প্রায় সকল কবিই সেই একই অনুসৃত পথে প্রধাবিত! সেই একই রূপ বর্ণনা, ঋতুবর্ণনা, যুদ্ধ বর্ণনা ইত্যাদি প্রায় সকল কাব্যেই দৃষ্টিগোচর হয়। কোন নবীনত্ব নাই। কোন মৌলিক ভাবগাম্ভীর্য্য নাই, সেই চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে করিতে, সেই এক ঘেঁয়ে ভাবে, নূতন ভণিতা লইয়া কত কবিই না লোকলোচনের সম্মুখে আসিয়া আজ দাড়াইয়াছেন। আবার ছোট কথাকে বড় করিতে যাইয়া অনেক কবি তাকে এমন বিস্তৃতিদোষ দুষ্ট করিয়াছেন যে, তাহা পড়িয়া উঠাও বর্ত্তমান কালে অনেকের পক্ষে অসম্ভব। প্রস্তাবের শীর্ষোক্ত, অদ্যকার আলোচ্য "লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়" ও তচ্ছ্রেণীর গ্রন্থরাজির অন্যতম গ্রন্থ।

ইহা প্রাচীন গ্রন্থ। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন, এই ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের দিগ্বিজয় কাহিনী ইহাতে অতি বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। রামচন্দ্র পশ্চিম দিকে, লক্ষ্মণ পূর্ব্বদিকে, ভরত দক্ষিণ দিকে এবং শত্রুঘ্ন উত্তর দিকে অভিযান করেন। প্রথমে লক্ষ্মণ, তৎপর শত্রুঘ্ন, তৎপর ভরত এবং সর্ব্ব শেষে রামচন্দ্রের অভিযান বর্ণিত হইয়াছে। লক্ষ্মণের বিজয়কাহিনী গ্রন্থের অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়া আছে। এই বিরাট গ্রন্থের আদ্যন্ত নিরন্তর নীরস, শ্রুতিপীড়ন, অসম্ভব ও অবাস্তব যুদ্ধবর্ণনা। আমরা ভীরু ভেতো বাঙ্গালী; প্রবল বাত্যান্দোলনে পরস্পর পীড়ন-জাত কীচকধ্বনি শুনিলে আমাদের প্লীহা চমকায়! সদ্যপ্রাণহারী বজ্রনাদী কামানের নিরবচ্ছিন্ন গুড়ুম্‌গাড়ুম শব্দ, হস্তীর ভীষণ বৃংহিত বাতপ্রমী অশ্বদলের হ্রেষারব, পদাতিক দলের বিবিধ অস্ত্রঝনঝনা, অগণনীয় সৈনিকবৃন্দের ঘোর কোলাহল! বাপ্‌রে বাপ্‌! এততেও আর প্রাণ থাকে? 'চমকিলে বিদ্যুৎ চমকি' রমণী অঞ্চলধারী আমরা, যুদ্ধ ভয়ে রাজ্যত্যাগী আমরা, রাজ্যলোভে যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বাসহন্তা আমরা অবশেষে আজ কিনা বিংশ শতাব্দীর উষাকালে ইংরেজের সুশীতল স্নিগ্ধ অঙ্কশায়ী থাকিয়া এই নিরন্তর যুদ্ধ কোলাহলে প্রবেশ করিয়া মূল্যবান দুর্লভ জীবনটি হারাইতে যাইব? সামান্য শৃগাল কুক্কুর হইতে আত্মরক্ষণে অক্ষম আমরা, যুদ্ধবিগ্রহের কথা আমাদের সাজে কি? যুদ্ধ বীরের কাজ, বীরজাতির ধর্ম্ম। যুদ্ধের নামে

বীরজাতির হৃদয় পুলকে ভরিয়া উঠে, ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ রক্তপ্রবাহ ছুটে। কবি আনাওল একটা সুন্দর উপমাই না দিয়াছেন :—

যার যেই যুক্ত কর্ম্ম সেই জানে ভালে।
স্বর্ণ রত্ন জাড়ন না জানে পাটিয়ালে॥

এক্ষেত্রেও কি তাহাই হয় নাই? বানরের গলায় মুক্তার মালার যেমন শোভা হয় না, ভেড়ার কর্ণে মন্ত্র দিলে যেমন মন্ত্র সিদ্ধি ঘটে না, তেমন দুর্ব্বল-প্রাণ ভীরু বাঙ্গালীর কর্ণেও যুদ্ধ বর্ণনা ভাল শুনায় না।

কিন্তু ইহার কবি তোমার আমার মনস্তুষ্টির জন্য এই প্রকাণ্ড নীরস গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। আজ কালকার দিনের মতন এখনকার কবি বা লেখক-দিগকে গ্রন্থের কাট্‌তির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইত না। সেই কালে জমিদার বা রাজাদের প্রতি পালিত দাস, নফর, পাহালওয়ান যেমন থাকিত, সভাপণ্ডিত বা সভাকবিও থাকিত। (হায়! এ অধঃপতিত ভারতের ভাগ্যে সে দিন কি আর হইবে?) আমাদের সমালোচ্য কাব্যের রচয়িতা পণ্ডিত ভবানীনাথ ও জয়ছন্দ * নামক কোন বিদ্যোৎসাহী রাজার সভাপণ্ডিত পদে সমাসীন ছিলেন। তাঁহারই মনস্তুষ্ট্যর্থে, তাঁহারই আদেশে কবি এই গ্রন্থ খানি "ব্যাসসংহিতা" অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন।

কবি লিখিয়াছেন ;—

জয় ছন্দ নরপতি স্বদেশী ব্রাহ্মণ।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ করিল রচন॥

ইহাতে বুঝা যায় যে, কবি রাজার স্বদেশীই ছিলেন; কিন্তু জয়ছন্দ কোথাকার রাজা? সে কালের জমিদারেরা রাজোপাধি ধারণ করিতেন,—অনেকে রাজকীয় ক্ষমতাবিশিষ্টও ছিলেন, ইনিও কি সেইরূপ কোন জমি-

* প্রখ্যাত নামা প্রাচীন-সাহিত্য-বিৎ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' ইহাঁকে 'জয়চন্দ্র' নামে পরিচিত করিয়াছেন। রচয়িতার নাম সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যাইতেছে। আমি প্রাচীন কালের ৫।৬ খানি পুঁথি দেখিয়াছি, তাহাতে কোথাও 'জয়চন্দ্র' নাম দেখি নাই। দীনেশবাবু সম্ভবতঃ বটতলার ধুরন্ধরগণের ছাপা পুঁথি দেখিয়াই এইরূপ লিখিয়াছেন। উক্ত মহাত্মারা 'জ অছন্দ' নামের অপূর্ব্বত্ব দেখিয়াই উহাকে 'জয়চন্দ্র' এই সুন্দর ও সাধারণ নাম দিয়াছেন, আমার খুব বিশ্বাস। হস্তলিপিতে সর্ব্বত্রই 'জঅছন্দ' নাম আছে। এই পুঁথিতে আমি অন্য কোন কবির ভনিতা পাই নাই। 'জয়ছন্দ' কোন বৌদ্ধের নাম হইতে পারে নাকি? ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৩০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

দার? অথবা কবি নিজ প্রতিপালক প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্যই এইরূপ একটা মিথ্যা উপাধি সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন? কবি প্রায় সকল স্থানেই :—

"জয়ছন্দ নরপতি রসিক সুজন অতি,
সভাসদ ভবানী ব্রাহ্মণ।
নৃপতি আদেশ পাইআ, ব্যাসের সংহিতা চাইআ,
সুরচিত কৈল পদবন্ধ॥"

এইরূপ ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। কবির কথায় আরো জানা যায় যে, জয়ছন্দ অতিশয় প্রজারঞ্জক—প্রজার পিতৃ সদৃশ ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবি এত প্রকাণ্ড গ্রন্থে কোথাও তাঁহার বাস স্থানের বা রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই। গ্রন্থের এক স্থলে তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে :—

চন্দ্রশিখর যেই না দেখে নয়ানে।
গমন না করে যেবা বাড়বের স্থানে॥
লবণাক্ষ মহাতীর্থ যেবা না করিল।
জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি যদি পরশ না কৈল॥ ইত্যাদি।

এই চন্দ্রশেখর, বাড়ব কোথায়? চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড নামক তীর্থস্থানে উক্ত নামধেয় তীর্থাদির বিদ্যমানতা সকলে জানেন। মুঙ্গেরে ও ঐ নামের তীর্থ আছে, বোধ হয়। এই কবি যে পূর্ব্ববঙ্গ বাসী, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাহাতে আবার চন্দ্রশেখরাদি উল্লেখ দেখিয়া, উক্ত অনুমানের অভ্রান্ততা আরো স্পষ্ঠ অনুভূত হইতেছে। আমাদের বোধ হইতেছে, কবির নিবাস চট্টগ্রাম প্রদেশের আশ পাশে কোথাও হইবে। তাহা না হইলে, এই ভূভারতে এত তীর্থ থাকিতে, কবি চন্দ্রশেখরাদি উল্লেখ করেন কেন? পরে পাঠক দেখিতে পাইবেন, গ্রন্থে এমন অনেক শব্দ ও বিভক্তিচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে যাহাতে কবিকে চট্টগ্রাম সান্নিধ্য-বাসী বলিবার পক্ষে আমাদের মত সমর্থিত হয়।

গ্রন্থকার এবং গ্রন্থের আদেষ্টা রাজা জয়ছন্দ কোথাকার লোক, তাহাই যখন জানা গেল না, তখন এই গ্রন্থ কখন রচিত হইয়াছিল, জানিব কিরূপে? ইহার যে প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১১৫১ মঘীর লিখিত; তাহাতেই গ্রন্থের বয়স আজ ১১২ বৎসর দাঁড়াইতেছে। গ্রন্থের ভাষা পর্য্যা-

লোচনা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা অন্ততঃ দুই শত বৎসরের এদিকে রচিত হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, ইহার রচনা বড় নীরস। নীরস এই জন্য বলি যে, ইহা কেবল আদ্যন্ত যুদ্ধ বর্ণনা-পূর্ণ,—যুদ্ধ কথা ভিন্ন অন্য কথা ইহাতে কম আলোচিত হইয়াছে। সে জন্যই কোন স্থলেই পাঠকের চিত্ত সমাকৃষ্ট হয় না। তবে এই কথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, ইহার রচনা প্রণালী বিশুদ্ধ এবং সহজ। কবি নিজে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন ; কাজেই ব্যাকরণ দোষ ক্বচিৎ পরিলক্ষিত হইবে। পয়ার ও ত্রিপদীচ্ছন্দে ইহার যাবতীয় স্থল লিখিত। প্রাচীন অন্যান্য কাব্যাদির ন্যায় ইহাতে নানাবিধ রাগ রাগিনী বা ছন্দের অবতারণা নাই। ইহার জন্য আমাদের কবিকে অসমর্থ বলিলে অন্যায় করা হয় মাত্র ; কেন না, বিষয় হিসাবে ইহা ঐ রূপ পথাবলম্বনের স্থানও নহে।

এই গ্রন্থ বহু অধ্যায়-সমন্বিত। এক এক অধ্যায় আবার বহু স্থান-বিস্তৃত। আমাদের স্থান থাকিলে এখানে অধ্যায় গুলির নামোল্লেখ করিয়া দিতে পারিতাম।

কবিত্ব-সম্পদে সম্পন্ন না হইলেও এই গ্রন্থ হইতে আমরা দুইটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

১। জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় জীবনের ছায়া ইহাতে দেখিতে পাই। অর্থাৎ এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর পুচ্ছগ্রাহিতা ও স্বাধীনভাব পরিশূন্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

২। প্রাচীন কালের বহুবিধ শব্দ ও ক্রিয়া প্রভৃতির প্রয়োগ পদ্ধতি (যাহা অধুনা অপ্রচলিত) জানিতে পারি।

দিন দিন এখন যত প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হইতেছে, তৎসকলই মুদ্রা যন্ত্র সাহায্যে প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু তৎসমস্ত পুঁথি আলোচনা করিয়া তাহা হইতে জাতীয় ইতিহাস ও ভাষা ইতিহাসের আবশ্যক উপকরণ রাশি সংগ্রহ করা কিছুই অসম্ভব নহে। বহুতর মনস্বী ব্যক্তি এখন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের কথা। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও, আমি এখানে সমালোচ্য গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শব্দ ও বিভক্তি প্রয়োগ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

(১) সপ্তমী-বিভক্তির চিহ্ন 'এ' যোগ না করিয়া ব্যবহার।

'হেন কালে মহাশয়, উঠিলেন্ত গগন এ,
মিলিবারে ব্যূহের মাঝার।'
'সংসার গ্রাসিতে পারে বোলে সকল এ।'

(২) উত্তম পুরুষে নাম পুরুষের ক্রিয়া এবং নাম পুরুষে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহার।

'বুঝিলাম আমার হৈব উত্তরে গমন।'
(আমি)—'না জানিয়া চন্দ্রকলা দেশে পাঠাইল।
তার ফল পদে পদে এথানে পাইল॥'

(৩) সপ্তম্যন্ত পদের অপপ্রয়োগ।

'দেবতা জিনিলে ভাই প্রতিষ্ঠা সভাত।
যার যেই কার্য্য ভাই কর সহসাত॥'

(৪) ক্রিয়া প্রয়োগে সংস্কৃত বা প্রাকৃতের অনুসরণ।

'সম্বর আপনা কোপ চাহসি, কল্যাণ।'
'রঘুবংশে পূর্ণ ব্রহ্ম হই জন্মিছেন্ত।
'ঘরে ঘরে যজ্ঞ হোম পঠন্তি পুরাণ।'
'বোলম্ তোমা ঠাঁই।' 'একা রথে বসুমতী জিনিতে পারম্।'

(৫) প্রশ্নবোধক 'কি' স্থলে 'নি' প্রয়োগ।

'শুনিলা নি লক্ষ্মণের মহাসিংহনাদ ?'

(৬) 'কি জন্য' অর্থে 'কিসেরে' প্রয়োগ।

'আপনার নারী যেবা রাখিতে না পারে।
তার সঙ্গে যুদ্ধ আমি করিমু কিসেরে॥'

(৭) 'প্রায়' বা 'ন্যায়' অর্থে 'ময়' ব্যবহার।

'ঘোর অন্ধকার হৈল রাত্রি অতিশয়।
অস্ত্র সব পড়ে যেন বিদ্যুতের ময়॥'

(৮) বিবিধ স্থানে প্রযুক্ত এই শব্দগুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল ; যে অর্থে শব্দগুলির ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেই অর্থ ও এখানে দেওয়া গেল ঃ—

বাৎ (বার্ত্তা) রথখণ্ড (রথখানি), পেলে (ফেলে), বাহুড়িল *

* 'গোকুল মঙ্গল' নামক নবাবিষ্কৃত গ্রন্থে 'বাহির হইল' অর্থে 'বাহিরাইল' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই শব্দটিই কোনরূপে 'বাহুড়াইল,' বাহুড়িল' শব্দে পরিণত হইয়া থাকিবে।

(নিকনিল বা ফিরিল), তুরমান (ত্বরায়), দেয়ান (কাচারী), কোঙর (কুমার), কথি (কি প্রকারে), সমশ্বর (সমান), ছাওয়াল (বালক), খাঁখার (কলঙ্ক), হোনে (হইতে), তাজি (তেজস্বী), অথান্তর (বিপদ বা দুঃখ), আচম্বিত (হঠাৎ) পুটাঞ্জলি (কৃতাঞ্জলি), আছৌক (থাকুক), সমে (সহিত), তান বা তাহান (তাহার), এড়িলেক (ত্যাগ করিলেক), লড়িল (চলিল), ফাঁকর (ব্যাকুল), শ্রোতা (হস্তী শুণ্ড), পোথা (পুঁথি), জোকার (জয়ধ্বনি, যথা, 'নারীগণে দেয়ন্তি জোকার'।)' উভা (দণ্ডায়মান, যথা, 'দুই দণ্ড উভা থাকে ব্রহ্মার যে দ্বারে'।), খাটিল (মর্দ্রিত করিল, যথা, 'গজবাজি যথ ইতি খাটিল নয়ান'।), ভেল সাধারণ অর্থ 'হইল', কিন্তু 'গেল' অর্থ ও হয়; যথা,—"মৃগয়াতে শঙখু গেল, তার ঘরে আমি ভেল, বৃন্দার সতীত্ব কৈলাম নাশ।"), ঠাকুরাল † (প্রভাব; যথা,—"ধনে ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়ে ঠাকুরাল।")।

(৯) কর্ত্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্য একান্তই সুলভ; এই কাব্যেও তাহার অভাব নাই। যথা,

'উর্ম্মিলাএ বোলে প্রভু শুন মোর বাণী।

(১০) অসমাপিকা ক্রিয়া গুলি প্রায় সর্ব্বত্রই 'আ' দিয়া লিখিত হইয়াছে। যেমন,—'করিআ' 'গিআ' ইত্যাদি।

(১১) 'সুন্দরী' অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে, রূপসী' শব্দের প্রয়োগ আমাদের মধ্যে খুবই প্রচলিত; কিন্তু 'রূপস' শব্দের তাদৃশ ব্যবহার আছে বলিয়া মনে হয় না। এই কাব্যে তাহার ব্যবহার এই দেখুনঃ—

'ভারতের সৈন্য সবে সেবএ বিশেষ।
সুবর্ণের ছত্র শোভে দেখিতে রূপস॥'

(১২) নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে 'তরল', 'রহস্য' এবং 'বিদগ্ধ' শব্দগুলি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দ্রষ্টব্য।

† এই শব্দের প্রকৃতরূপ 'ঠাকুরালী';—সংক্ষেপে 'ঠাকুরাল' হয়। দীনেশ বাবু মিঃ গ্রিয়ারসনের মতানুযায়ী ঐ শব্দটিকে 'ঠাকুরাণী' মনে করেন। 'ঠাকুর' এর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঠাকুরাণী' হয়; 'প্রভাব' অর্থে তাহা হইতে পারে না। এই শব্দ সম্বন্ধে আমি 'পূর্ণিমা' ৮ম বর্ষের ৫—৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'সাহিত্য সম্বাদ' প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। ('বঙ্গভাষাও সাহিত্য ৪৬ পৃষ্ঠা ফুটনোট দেখুন।)

(ক) 'কাটিতে কাটিতে ধনু টুটি গেল বল।
পালায় সকল সৈন্য হইয়া তরল॥'

(খ) দুষ্ট জন নাশ করি, সমরে জিনিবা বৈরী,
রণে পুনি না হৈবা তরল।'

(গ) রাজ্যরক্ষা হেতু কারে কৈল অধিকার।
শুনিতে সে সব কথা রহস্য আমার॥

(ঘ) 'রক্ত মাংসে নদানদী ভাসি যায় রথ।
পলায় সকল সৈন্য হই বিদগধ॥'

(১৩) 'ভারতী' শব্দে সাধারণতঃ বাক্য, সরস্বতী এবং এক শ্রেণীর সন্ন্যাসীর উপাধি বুঝায়, কিন্তু এই গ্রন্থে বিশেষণ স্বরূপে উহা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা উচিত; যথাঃ—

(১) 'ডাকিয়া আনহ গিয়া লক্ষ্মণ ভারতী।'

(২) 'হনুমন্ত সারথি যে বিদ্যুতের গতি।
তাহাতে লক্ষ্মণ বীর সমরে ভারতী॥'

(১৪) 'অবসাদ' শব্দটী বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু কোন স্থলেই বর্ত্তমান কাল প্রচলিত অর্থ, সঙ্গতি দেখা যায় না। যথাঃ—

(১) 'মহাবীর লক্ষ্মণে করিল সিংহ-নাদ।
জিনিবেক চক্রশালা এই অবসাদ॥'

(২) 'এ বোলিয়া সিংহনাদ, নাহি তাহে অবসাদ,
কাল সৈন্য ভঙ্গ দিল রণে।'

(৩) 'পূর্ব্বমুখী চলে সৈন্য করি সিংহ-নাদ।
দেখিয়া কাঞ্চন পুরী লোক অবসাদ॥"

(৪) 'কোকিলার কলরব নাই অবসাদ।
নানা পক্ষী কলরব ভ্রমরের নাদ॥'

(১৫) বহুবচন স্থলে 'আমরা', 'দেবতাগণ' ইত্যাদির পরিবর্ত্তে 'আমি সব', 'দেবতারগণ ব্যবহৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া উঠিল। গ্রন্থের রচনার নমুনা স্বরূপ নিম্নে কলিযুগ বর্ণনা হইতে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া ইহার উপসংহার করিব।

লক্ষ্মণ বোলেন কথা শুন মুনিবর।
যুগধর্ম্ম কথা কহি অবধান কর॥

কলিঅবতার ধর্ম্ম কি কহিব আমি।
বেদার্থ ছাড়িব আর মহারাজধানী॥
গায়ত্রী না জপি অন্ন খাইব ব্রাহ্মণ।
মিথ্যা সাক্ষী দিব সব রাজার সদন॥
শিষ্যে গুরু না মানিব না পুষিব বাপ।
কলিকালে না লাগিব জননীর শাপ॥
পণ্ডিতেরে নিন্দিবেক মূর্খের আদর।
দুরন্ত কলির হেন মহিমা পামর॥
অক্রিয়া করিব যথ মহা মহা জ্ঞানী।
পাতকে পূর্ণিত হৈব ভারত মেদিনী॥
কৃপণ দুর্জ্জন যথ জন্মিবেক নিত।
অল্প শস্য হইবেক সকল ভূমিত॥
কলিযুগে অন্ন হৈব জীবের যে মূল।
অন্নের কারণে লোকে দিব জাতি কুল॥

দেখুন, দেশকালজ্ঞ লেখকের কথাগুলি কেমন অর্থ পূর্ণ ও ঠিক! অথ প্রবন্ধ পাঠের বা শ্রুতির ফল লিখ্যতেঃ—

"যেই জন শুনে মোর এই ইতিহাস।
সর্ব্বপাপ বিনাশিয়া অন্তে স্বর্গবাস॥
অপুত্রার পুত্র হএ নির্দ্ধনীর ধন!
মহারোগ খণ্ডে তার কি কৈব কথন॥"

আর চাই কি পাঠক মহাশয়?

শ্রীআবদুল করিম।

পল্লী সমাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মাছের অবস্থাও তথৈবচ। মাছ ত আর ডাঙ্গায় থাকিতে পারে না। এখন আর কেহ নূতন পুকুর কাটায় না। পুরাতন যাহা ছিল সবগুলিই বুজিয়া যাইতেছে। অনেক পুকুর জমি হইয়া গিয়াছে। মাছ হইবে কোথায়? আগে লোক আহারের পর ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে যাইত। এখন

আর সে যো নাই। অন্ন চিন্তা চমৎকার। অবকাশ কাহার আছে? আর থাকিলেই বা ধরিবেন কি? এ অঞ্চলের নদী গুলি, স্বয়ং ভাগীরথী পর্য্যন্ত, বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে শুখাইয়া যায়। মাছ বড়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই আমরা ঘোরতর বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি।

বাকী ভাত, ডাল। তাহাও যে সকলের ভাগ্যে দুবেলা জুটিয়া উঠে, তাহা আমার বোধ হয় না। ভদ্রলোকদের কথা যাহাই হউক, ইতরলোকে যে দুবেলা পেট পূরিয়া ভাত ডাল খাইতে পায় না, ইহার আমি সহস্র প্রমাণ পাইয়াছি। আমাদের বাড়ীর চাকরেরা এক বেলা আমাদের বাড়ীতে বসিয়া খায়। আর রাত্রের ভাত তাহাদের পরিবারেরা আমাদের বাড়ী হইতে নিজেদের বাড়ী লইয়া যায়। সুতরাং আমার ধারণা ছিল ঐ ভাত চাকরেরা বাড়ী গিয়া রাত্রে খায়। এবার পূজার পর সকলেরই জ্বর হইল। আমাদের মুখে জল দেয়, এমন কেহ লোক নাই। কাজেই আমার ইংরাজী পড়া বুদ্ধিতে এই ধারণা হইল যে, চাকরদের জন্য বাড়ীতে ভাত না রান্ধিয়া যদি তাহাদের সিধা দেওয়া যায়, তবেত অনেকটা ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যায়। বাবার নিকট এই প্রস্তাব করিলাম। মনে করিয়াছিলাম বাবা এই সোজা কথাটা বুঝিতে পারেন নাই কেন? বাবার উত্তর শুনিয়া আমার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িবার উপক্রম হইল; বাবা বলিলেন, সিধা দিলে কি উহারা কিছু খাইতে পাবে? বাড়ীতে বসিয়া দিলে যাহা খায়, উহাদের তাহাই আহার। রাত্রে যে ভাত লইয়া যায় তাহা কি উহারা খাইতে পায়?" কি সর্ব্বনাশ! আমরা শত মুখে ইংরাজ রাজত্বের গুণগান করি। সেই সুখময় ইংরাজ রাজত্বে কোন কোন শ্রেণীর গৃহে বারমাসই দুর্ভিক্ষ রহিয়াছে! আমি বিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছি, ইতর লোকে প্রায়ই ভাল খাইতে পায় না! কি করিয়াই বা পাইবে? মাসকলাইয়ের দর টাকায় কাঁচি বার সের!

এইত গেল মোটা মুটি খাদ্য দ্রব্যের কথা। এখন দেখা যাউক এই সব খাদ্য সামগ্রী ইচ্ছামত কিনিবার টাকা লোকের আছে কিনা ভারত চন্দ্র বলিয়াছেন, "কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মেলে।" পয়সা থাকিলে যেমন করিয়াই হউক, এক রকমে কাজ চালাইয়া লইতে পারা যায়। দেশটা ক্রমে দরিদ্র হইয়া যাইতেছে। 'দরিদ্র' এই হিসাবে বলিতেছি যে, প্রয়োজনানুরূপ আহার্য্য সামগ্রী কিনিবার টাকা লোকের হইয়া উঠিতেছে না। তবে কি লোকের হাতে পূর্ব্বের ন্যায় টাকা নাই? টাকা বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী

আসিতেছে। কিন্তু থাকিতেছে না। সেই টাকায় যদি আহারের জিনিস না কেনা হয়, তবে সেই টাকা লোকে করে কি? টাকা নানা বিষয়ে খরচ হইয়া যায়। বর্দ্ধিত হারে জমিদারের খাজনা, টেক্স দিতে হয়। সমস্ত জিনিসই উচ্চমূল্যে কিনিতে হয়। তাহা ছাড়া লোকের বিলাসিতা বাড়িয়াছে। তাহাতেও অনেক পয়সা যায়। এখনকার লোকের ধরণ হইয়াছে পেটে খাইতে পাউক আর নাই পাউক, একটু ফিট্ ফাট্ থাকা চাহি। একজোড় জুতা, একটা জামা ও একখান বিলাতি গায়ের কাপড়, ইহাত ভদ্রলোক মাত্রেরই চাই। যাহাদের পিতা, পিতামহ ছয় পয়সার চটিজুতা ও বনাতের তলে চাদর ব্যবহার করিতেছেন, আজ তাঁহারা দিব্য ফিতে বাঁধা জুতা, সার্জের চাদর, মাথায় কম্ফর্টার ও কোট লইয়া সদর্পে চলিয়া যাইতেছে। অথচ বুড়াদের আয় বেশী ছিল, তাহারা খাইত ভাল আর খাইবার শক্তিও বেশছিল। এখন হতভাগাদের পেটে অন্ন নাই, গব্যরস কখন উদরস্থ হয় নাই, অথচ বাবুগিরির চরম। ২০। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে জুতা, জামা, কোট ইত্যাদি বিলাস-সামগ্রী কলিকাতা হইতে আমদানি হইত না। সুতরাং লোকের দরকারও হইত না। শীতকালে দেখিতাম রৌদ্রে বসিয়া কোন কোন লোক মার্কিন কাপড় লইয়া দুই একটা সেলাই করিতেছে। তখন রেল ছিল কিন্তু কেহ কলিকাতা যাইত না। যাহার নিতান্ত সখ হইত সে সিউড়ি কিম্বা বহরমপুর হইতে বগলস্ লাগান এক জোড় জুতা কিনিয়া দুই তিন বৎসর ব্যবহার করিত। নাগোরা জুতাও দুই এক জোড় দেখিতাম। ছেলেরা কালে কস্মিনে জুতা পাইত। পায়ে দিত আর ফোস্কা হইত, কাজেই তুলিয়া রাখিত। এখন বীরভূমের নিভৃততম গ্রামও কলিকাতার ন্যায় সভ্য (?) হইয়াছে। এখন ছেলে ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার জন্য উলের টুপি, ষ্টকিং, জামা, কত কি কেনা হয়। বলিব কি, ছেলেদের জুতা ও পোষাক যোগাইতে অনেককে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইতেছে। আমরা নাহয় নিজে বাবু হইলাম; কিন্তু মেয়েদেরও যে বাবু করিয়াছি! রূপার অলঙ্কার আর ভদ্রলোকের মেয়েদের মনে ধরে না। তাহা ছাড়া বডি, শেমিজ বহুমূল্য কাপড়ও চাই। ইতর লোকেও কাঁসার গহনা ছাড়িয়া রূপার ব্যবহার করিতেছে। অথচ ঘরে খাবার নাই। সেদিন দেখিলাম, একটা হাড়ির মেয়ে মল পায়ে দিয়া ভাল কাপড় পড়িয়া যাইতেছে। তাহার অবস্থা ভাল হইয়াছে মনে হওয়ায়

একটু সুখ হইল। পরক্ষণেই শুনিলাম, তাহার পরিবারের কাহারও বিছানা নাই, বা রাত্রিতে শীতকালে কি গায়ে দিয়া শুইবে, তাহা কিছুই নাই। এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখিয়া তবে এ প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি। ধীরে ধীরে বিলাসিতা, বঙ্গের প্রতি পল্লীতে প্রবেশ করিয়াছে। লোকে পেটে না খাইয়াও নানারূপ বিলাস-দ্রব্য ক্রয় করিতেছে। লোকের এমনি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! একদিন প্রবল গ্রীষ্ম, সর্ব্বদাই শরীরে ঘাম ঝরিতেছে। আমি সেই দিন কেবল মাত্র একখান চাদর গায়ে দিয়া কোন সুপরিচিত ভদ্র সমাজে গিয়াছি। বীরভূমবাসী আমার যে সকল বন্ধু ছিলেন তাঁহারা কেহ কিছু বলিলেন না; কিন্তু মুরশিদাবাদবাসী কোন বন্ধু জামা গায়ে না দিয়া ওরূপ অভদ্র ভাবে লোক সমাজে আসার জন্য আমাকে কতই উপহাস করিলেন। তাঁহার ধারণা এই যে তুমি গরমে পচিয়া মর না কেন ক্ষতি নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের কাছে বাহির হইতে হইলে তোমাকে একটা জামা গায়ে দিয়া আসিতেই হইবে! অদ্ভুত সভ্যতা! এখন এই সভ্যতার ব্যয় যোগাইতে যে পেটের অন্নের যোগাড় করিতে পারিতেছ না, তাহার কি? ইহার একটা প্রতিকার করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে নাই কি?

আর একটা বিষয় লোকের ব্যয় বড় বেশী হইয়া পড়িয়াছে। সেটা মোকদ্দমা। এমন গ্রাম নাই যেখানে দুই একটা মোকদ্দমা না আছে। এখন লোকে কথায় কথায় মোকদ্দমা করে। অবশ্য বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে একজনের ত অন্যায় আছেই, তা বুঝিবার ভ্রমেই হউক, বা ইচ্ছা ক্রমেই হউক। এরূপ ভ্রম ও অন্যায়ের ইচ্ছা যে লোকের পূর্ব্বে ছিলনা তাহা নহে। তবে এখন আর বিবাদ মিটাইবার লোক নাই। পূর্ব্বে প্রতি গ্রামেই একজন করিয়া কর্ত্তা ছিল। তাহাকে সকলে মানিত। সে ব্যক্তিও নিরপেক্ষ ভাবে সকল বিবাদ বিসংবাদ মীমাংসা করিয়া দিত। এখন কেহ কাহাকে মানেনা। সুতরাং গ্রামে আর বিবাদের মীমাংসা হয় না। কথায় কথায় আদালত। পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, এমন লোককেও খুব উৎসাহের সহিত মোকদ্দমা করিতে দেখিয়াছি। ইহাকে কি বলে? একটা লোক আমার পাঁচটাকা ক্ষতি করিয়াছে। সে পাঁচ টাকা দিলে না। আমি ১০ টাকা খরচ করিয়া আদালতে নালিশ করিলাম। তাহার উপর ঐ পাঁচ টাকা ডিক্রি করিতে আমার ৫০৲ টাকা খরচ হইয়াগেল। অথচ সে আপোষে আমাকে ৫৲ টাকা দিবে না; আর আমারও ৫০৲ টাকা

খরচ করিয়া সেই ৫৲ টাকা লওয়া চাই। একব্যক্তি আমাদের সঙ্গে একটা মোকদ্দমা হারিয়া ৭৲ টাকা খরচের দায়ী হইয়াছিল। সে টাকা দিল না। ডিক্রিজারি হইল; সে আপত্তি দিল। আপত্তি টিকিল না। সে আপীল করিল। তাহাতেও হারিল। তাহার পর সেই ৭৲ টাকার জন্য হাইকোর্টে আপীল করিল। সেখানেও হারিয়া খরচ শুদ্ধ ৬০৲ টাকা দায়ী হইল। আমাদেরও মোকদ্দমা চালাইতে ৬০৲ টাকা খরচ হইয়াছিল। কিন্তু সে লোকটার নির্বুদ্ধিতা দেখুন। এইরূপ অনেকেই আছেন। গ্রামে গ্রামে এমন লোক আছে যাহার মোকদ্দমা করা প্রধান কাজ। ভদ্রলোক মামলাবাজ হওয়াতে অপরাপর লোকেও বেশ আদালত চিনিয়াছে। জমিদার একটু চালাকি করিলে কৃষকেরা ত আর খাজনা দেয় না। হয় মনি অর্ডার করে না হয় মোকদ্দমা করে। এখন ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় কৃষকদের গৃহে সময়ে সময়ে মামলা মোকদ্দমার সমালোচনা। ইন্দ্র বাবু বড় উকিল, না তারাপ্রসন্ন বাবু বড় উকিল ইহা লইয়া ঘোর তর্কবিতর্ক দেখিয়াছি। অমুক 'বেলেস্তার' আসিয়া অমুক হাকিমকে যে জব্দ করিয়া গেল! এইসব কথা! একটা মজার কথা শুনুন। আমি তখন আইন পড়ি নাই। একটা মামলাবাজ লোক আমার নিকট একটা রায় বাঙ্গালা করাইবার জন্য আসিয়াছে। বাঙ্গালা করিতে করিতে আমি একস্থানে দেখিলাম misjoinder নামে একটা কথা আছে। ডিক্সনারিতে যে যে অর্থ দেখিলাম তাহা বাঙ্গালা সহজে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। তাই ভাবিতেছিলাম। আমাকে ভাবিতে দেখিয়া লোকটা বলিল "কিগো কি ভাবিতেছ?" আমি তাহাকে ভাবনার কারণটা বলিলাম। সে বলিল, "এর জন্য আর ভাবনা কি? "মেজেণ্টার" দোষ ত, তা তুমি 'মেজেণ্টার' লিখিয়া দাও আমি বুঝিতে পারিব।" আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। দুঃখের কথা বলিব কি আমাদের গ্রামের কোন কোন ভদ্রলোকের জন্য একটা বাগ্দী কয়েক বার আদালতে সাক্ষ্য দিয়াছিল। সে এখন এমন সভ্য ও এটিকেট্ দুরস্ত হইয়াছে যে তাহার সঙ্গে কথা কহা এক বিড়ম্বনা। সে এক মিনিটে ২০ বার, 'আজ্ঞে মহাশয়' 'বিবেচনা করুন' ইত্যাদি বলিবে। আর এখন সে অনেককে মোকদ্দমার সলা পরামর্শ দেয়। লোকে মোকদ্দমা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, পেটে খাইবার পয়সা কি আর থাকে? এসব ছাড়া কন্যার বিবাহ, পূজা পার্ব্বণ, ছেলেদের লেখপড়া শেখান এসকলেই ত বেশ

খরচ আছে। ভদ্রলোকের কন্যা-দায় ত আছেই, তাহা ছাড়া পুত্র-দায়ও হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উদ্ধবর্ণের ছেলেদের লেখা পড়া না শিখাইলে ত আর উপায় নাই। লেখা পড়া শিখা ভিন্ন জীবিকার্জ্জনের ইহাদের আর কোন উপায় নাই। অথচ উচ্চবর্ণের আর্থিক অবস্থা দিন দিন মন্দ হইয়া পড়িতেছে। আর লেখা পড়া বলিতে ইংরাজী লেখা পড়া বুঝিতে হইবে। কেন না বাঙ্গালাটা বিদ্যার মধ্যেই নয়। বাঙ্গালা শিখিয়া ত আর আজকাল পয়সা রোজকার করা চলে না। কাজেই ছেলেদের ইংরাজী শিখাইতে হয়। ইংরাজী লেখা পড়াটা কিন্তু "দিল্লীকা লাড্ডু"। মা বাপে মনে করিতেছে, ছেলে আমার ইংরাজী পড়িতেছে, একটা হাকিম উকিল হইবেই। শেষে বি-এ পাশ করিয়া ৩০৲ টাকার মাষ্টারিও জুটে না। আর ইংরাজী লেখা পড়ায় খরচ কত! পুস্তকের দাম, বেতন, খাওয়ার খরচ, পোষাকের খরচ, এইসব খরচে ছেলের মা বাপ মারা যায়। একটা ছেলেকে বি-এ, পাশ করাতে যে খরচ হয়, তাহার সুদ শুদ্ধ সমস্ত টাকা শোধ করিতে সে জীবনে পারে না। এই ইংরাজী লেখা পড়াতেও লোকের অনেক টাকা যাইতেছে। কিন্তু এ খরচটা কমাইবার উপায় নাই। কেন না, ইংরাজ-রাজত্বে লোককে ইংরাজী শিখাইতে হইবে। তাহার পর দেখা যাউক, আহার করিবার ক্ষমতা লোকের পূর্ব্বের ন্যায় আছে কি না? পূর্ব্বের ন্যায় থাকা দূরের কথা, পূর্ব্বের অর্দ্ধেকও নাই। বৃদ্ধেরা এখনও যাহা আহার করেন, আমরা তাহার অর্দ্ধেকও পারি না। বাল্য কালে ভোজ ফলারে দেখিয়াছি, এক এক ব্রাহ্মণ আহার করিত কত! এখনকার দুর্দ্দশার তিন কারণ অনুমান করা যায়। প্রথম বাল্য হইতে আহারে অনভ্যাস; ২য়, ম্যালেরিয়া; ৩য়, বর্ত্তমান সময়ে স্কুল আফিস্ ইত্যাদিতে যাইবার ইংরাজী নিয়ম। পূর্ব্বাপেক্ষা দুগ্ধ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হওয়ায় ছেলেরাও আর পূর্ব্বের ন্যায় খাইতে পায় না। তাহা ছাড়া এখন ছেলেরা গর্ভ হইতে লিভার পিলে লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং ভূমিষ্ঠ হইয়াই ডাক্তারি ঔষধ খাইতে আরম্ভ করে। তাহার পর যত বড় হয়, ততই রুগ্ন হয়। ঔষধ ব্যবহারের মাত্রাও সেই অনুপাতে বাড়িয়া থাকে। সুতরাং ভাল করিয়া খাইতেও পারে না; খাইবার অবকাশই বা কোথায়? ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে এদেশের লোক কুইনাইন দেখে নাই। ঐ সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রথম শুভাগমন হইল, আর লোকে কুইনাইন ও নানাবিধ ডাক্তারি ঔষধ

ব্যবহার করিতে লাগিল। অচিরাৎ গ্রামে গ্রামে ডাক্তার জন্মিল। সকলেই ঔষধ খাইতে লাগিল, লোকের সর্ব্বনাশ সেই হইতে আরম্ভ হইল। এখন ডাক্তারি ঔষধ না খাইয়াছেন এমন লোক নাই। আর একটা কথা, এদেশের জলও খারাপ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের পুষ্করিণী গুলির পঙ্কোদ্ধার না হওয়ায় সে গুলির জল আর পূর্ব্বের মত নাই। নূতন পুষ্করিণী খনন কেহ করে না। আগে লোকে বলিত "বীরভূমের জলে লোহা হজম হয়" এখন আর সেদিন নাই। সব দেশ সমান হইয়াছে। এসব কথা পরে আরও বেশী করিয়া বলিব।

আর সর্ব্বনাশ করিতেছে আমাদের স্কুলে। ১০ টার সময় স্কুলে যাইতে হইলে ৯ টার সময় আহার করা চাই। ৯টার মধ্যে কি গতরাত্রের ভাত হজম হয়? হজম হউক আর নাই হউক, ৯টার সময় ছেলেকে ভাত খাইতেই হইবে। তাহার পর পরিপূর্ণ-উদরে স্কুলে গিয়া নানা বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। ইহাতে কি মানুষ বাঁচে? বাঙ্গালীর যে বড় কঠিন প্রাণ, তাই বাঁচিয়া আছে। তবে আর বিলম্ব নাই, আমরা শীঘ্রই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া যাইব। ইংরাজের আগমনে আমাদের যত অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার চৌদ্দআনা কুপ্রথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী আমার কোন বন্ধুকে ত আমি সবল ও সুস্থকায় দেখিলাম না। আমাদের আহার করিবার অক্ষমতা যখন বৃদ্ধেরা দেখেন, তখন বলেন "তোদের বয়সে আমরা জল চিবাইয়া খাইয়াছি; না খাইয়া তোমাদের পেট মরে গেছে।" না খাইয়াই বটে, অসময়ে খাইয়া অনেকটা, আর রোগের দৌরাত্ম্যে ষোলআনা। এসব দেখিয়া শুনিয়া আর কোন কাজে উৎসাহ হয় না। ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইতে ইচ্ছা হয় না। লেখাপড়া শিখিতে শিখিতে যদি মৃত্যুদ্বারে অগ্রসর হয়, তবে এমন লেখাপড়া শিখাইতে কোন্ মাতা পিতার ইচ্ছা হয়? অথচ না শিখাইয়া করা যায় কি? বাঙ্গালীর ধ্বংস অনিবার্য্য।

চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদ।*

শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগ।

৪৭ হইতে ৫২ পর্য্যন্ত পদগুলি প্রকাশিত।

নিম্নের পদটি পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত আছে।

অথ সাক্ষাৎ দর্শন যথা। রাগ যতিশ্রী।

যাইতে দেখিল শ্যামে, কি করিবে কোটী কামে
ভাঙ ভঙ্গিম সুঠাম।
চাঁদ বদনে চাহে যাহা পানে
সে ছাড়ে কুল অভিমান॥
সই এমন সুন্দর কান।
হেরি কুলবতী ছাড়ে নিজপতি
ত্যজি লাজ ভয় মান॥
অতি সে শোভিত বক্ষঃ বিস্তারিত
দেখিয়ে দর্পণাকার।
তাহার উপরে মাল শোভি আছে ভাল
উপজে মদন বিকার॥
নাভির উপরে জন্তু তমাল জিনিয়া তনু
দলিত অঞ্জন জিনি আভা
বড় কারিকর কুন্দিয়াছে ভাল
বামকদলী শোভা।
চরণ নখের কোণে রঞ্জিত শোভিত মনে
মণিময় নূপুর তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া ওরূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায়॥ ৫৩॥

ইহার পর অনেক গুলি পদ প্রকাশিত।

যথা রাগ। অভিসার চন্দ্রের প্রতি আক্ষেপ। চন্দন গঞ্জন।

চাঁদ গগনে যদি তোর পাই লাগি।

---

* পরোটা-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।

লোহার মূষলে ভাঙ্গিয়ে তোমারে
করিমু শতেক ভাগি ॥
শিখি সব তন্ত্র রাহুগ্রহ মন্ত্র
সাধন করিব আগে।
উগারে না দিয়া চাঁদ ঘুচাইয়া
তবেই গরব ভাঙ্গে ॥
পূজি দেবরাজ সাধিব একাজ
ঢাকিয়া রাখিব মেঘে।
অমাবস্যা তিথি আঁধারিয়া রাতি
তেমতি সদাই লাগে ॥
পরাশর তাথে মৎস্য গন্ধা সাথে
কুহায় সুরতরঙ্গ।
চণ্ডীদাসে ভনে রাধিকার সনে
ঐছল শ্যামের রঙ্গ ॥৮০॥

রাগযতি। চন্দ্র উক্তি।

শুনগো রাধিকা চাঁপার কলিকা
অধিক উজর কে।
কত কোটী চাঁদ উদয় করেছ
একলা তোমার দে ॥
তুয়া এক পদ চাঁদ শত নিন্দে
দণ্ড অধিক শোভা।
তোমার তরাসে উছলি আকাশে
দেখিয়া ওরূপ আভা ॥
কেবা তোমার অধিক উজর
তোমার অঙ্গের মলা।
বিধি আগে আনি ভাঙ্গি খানি খানি
ধরে মোর ষোল কলা ॥
সিন্দুরের ফোটা অধরের ছটা
অরুণ কাঁপিতে থাকে।

অরুণ সাহসে লক্ষান্তরে থাকে
আমি পক্ষান্তর নাথে ॥
খঞ্জন গঞ্জন ওযুগ নয়ন
নাসা জিনি তিল ফুল।
হেরিয়া বদন আকুল মদন
কি আর দিব সে তুল ॥
গৃধিনী জিনিয়া শ্রবণ যুগল
নয়ান বয়ান ভূষা।
রূপের কথন নহে নিরীক্ষণ
চণ্ডীদাস করে আশা ॥ ৮১ ॥

রাগ পট্টমঞ্জরী।

কহিও বঁধূরে নতি কহিও বঁধূরে।
গমন বিরোধ হৈল পাপ শশধরে ॥
গুরুজন সম্ভাষিতে কৈল যত ভীতি।
নিজ পতি সম্ভাষিতে গেল আধরাতি ॥
যদি চাঁদ ক্ষমা করে আজুকার রাতি।
তবেত পাইব আমি বঁধূর সংহতি ॥
অমাবস্যা প্রতিপদে চাঁদের মরণ।
সে দিনে বঁধূর সনে হইবে মিলন ॥
চণ্ডীদাসে বলে তুমি না ভাবিহ চিতে।
সহজে একথা বটে কেন পাও ভীতে ॥ ৮২ ॥

রাগ ধানশী।

কহিও তাহার ঠাঁই যেতে অবসর নাই
আফুরাণ হল গৃহ কাজে!
শাশুড়ী সদাই ডাকে ননদী লহরী থাকে
তাহার অধিক দ্বিজরাজে ॥
সজনি কোপ করেন দুরন্ত।
গৃহ কর্ম্ম করি ছলে বিপিনে যাইবার বেলে
আকাশে প্রকাশ ভেল চন্দ্র ॥

যোকুলে বিচ্ছেদের ভয় একুলে নহিলে নয়
সুসাসারিতে (?) নিশি গেল আধা।
আসিয়া মদন সখা হেন বেলে দিলে দেখা
কহ দূতী কি করিবে রাধা ॥
লোহার পিঞ্জরে থাকি বেরহিতে চাহে পাখী
তার হৈল আকুল পরাণ।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় আর কি বিরহ সয়
তুরিতে মিলব বরকান ॥ ৮৩ ॥ ইতি অভিসার সমাপ্ত।

বাসক শয্যা।

কিশলয় সেজ করি কেন জাগি রাতি।
মদন দুরজন তাথে সঙ্গ হৈল ভাঁতি ॥
চন্দ্র কিরণ তাহে বৈরী মোর ভেল।
দক্ষিণ পবন মোর সমূহ দুখ দেল ॥
অবহু এখন বঁধূ না আইল ইহা।
কেমনে ধরিব প্রাণ এত দুখ সয়া ॥
কাল রাতি কাল মোর দংশিল শরীরে।
কি আর অষুদ আছে বলনা আমারে ॥
ধন্বন্তরি কাছে গিয়া সাধিব সব তন্ত্র।
ঘুচাব সকল জ্বালা কাল যে ভুজঙ্গ ॥
মৃতমণি মন্ত্রে যেন মৃত হ'য়ে যায়।
তাহার অধিক যেন হৈল সব কায় ॥
চণ্ডিদাস বলে এই সময়ের দোষ।
বিরস না ভাব তুমি না করিহ রোষ ॥ ৮৪ ॥

অথ উৎকণ্ঠা।

নিশি প্রভাত হৈল প্রিয়া না আইল ভুবনে।
হেদেরে মালতীর মালা কেন গাঁথিলাম যতনে ॥
অগরু চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
জর জর হৈলে তনু নিশি না পোহায় ॥

কর্পূর চন্দন চুয়া দিব কার মুখে।
রজনী বাঞ্ছব হাম কারে লয়ে সুখে ॥
না হয় নিঠুর যদি না আইসে ইহা।
যমুনার জলে সব দিব ভাসাইয়া ॥
কার লাগি রাখিব ইহা সংযোগ করিয়া।
চণ্ডীদাসে কহে তবে মিলিব আসিয়া ॥ ৮৫ ॥

অথ বিপ্রলব্ধা। রাগ পটমঞ্জরী।

আর কি মিলিব মোরে প্রিয়া গুণনিধি।
কি রাতি সুরাতি হবে অনুকূল বিধি ॥
গগনে আছিল চাঁদ সেই অতি মন্দ।
হিয়া জর জর হৈল খসিল পাঁজরের অঙ্গ ॥
এখনে না আইল প্রিয়া কে কৈল আটকে।
নিজ ঘরে রহিল কিবা পড়িয়া বিপাকে ॥
শরীরে না রহে প্রাণ বাহিরায় এখনে!
পরাণ গেলে কি করিবে প্রিয়া দরশনে ॥
চণ্ডীদাসে কহে প্রাণ যাইবেক কেনে।
চিতস্থির করি রহ মিলিব এখনে ॥ ৮৬ ॥

রাগ কামদ।

নাহি নিঠুর রীত ভেল কাহার চিত
তাহি রহল আজুরাতি।
প্রাণ গুনি গুনি খোয়ানু পরাণী
সহজে অবলা নারী জাতি।
চণ্ডীদাসে ভনে মরম সমানে
না মিলিল আর কান।
জীবন যৌবন বৃথা অকারণ
কেমনে ধরিব প্রাণ ॥ ৮৭ ॥

যথা রাগ।

আমার বাসনা না হ'লে তোষণা
আখের হইল আর।
নিরবধি বিধি এমতি করিলে
কেমন ব্যাপার তার॥
সায়র নিকটে চাঁদ মিলব
ঘুচিবে মনের দুখ।
সুধা যে ক্ষরিবে অঙ্গ যুড়াইবে
পাইবে পরম সুখ॥
পাপনারী করি জনমিলে হরি
পরের পতির আশে।
কহে চণ্ডীদাসে না মিলল শেষে
আপন করম দোষে॥ ৮৮॥

রাগ নটনারায়ণ।

শুন ওগো সই আর তোমা বই
কহিব কাহার কাছে।
লোক মুখে শুনি ইহা বলে নাকি
কানু সনে রাধা আছে॥
গোকুল নগরে গোপ সমাঝারে
এত দিনে আছি মোরা।
লোক মুখে শুনি কখন না শুনি
কানু কাল কিবা গোরা॥
ঘরের ধরণী আছে কালবাদিনী
পাপমতি ননদিনী।
শুনাইয়া মোকে আর কা'কে ডাকে
এস শ্যাম সোহাগিনী॥
কেবা সে শ্যাম কানুকার নাম
তাহা না বলিব কি।

শুনাইয়া মোকে আর কা'কে ডাকে
আই মাইকে জানাই দেখি॥
একা প্রাণপতি সেই মোর গতি
তা বিনু আর নাহি জানি।
চণ্ডীদাসে বলে দচাইলা (?) ভালে
ধন্য রাধা ঠাকুরাণী॥ ১২৮॥

বাঁশির নিশ্বাস কানে সাঁন্ধাইল বিষস্বরে
এ অঙ্গ জ্বালিয়া গেল মোর।
কেবা করে প্রাণ দান সেবয়ে বা কোন্ জন
তবে যায় এ দুঃখের ওর॥
সই হিয়া কেনে মোর কাঁপে।
নয়ানে ঝরয়ে নীর পরাণী না রহে স্থির
এই বাঁশীর মধুর আলাপে॥
মিলাইছে শিলারাশি চকিত হইল শশী
মোর কাছে নাচিছে আসিয়া।
নারীর যৌবন ধন তাথে তার আছে মন
তেই পূরে হাসিয়া হাসিয়া॥
কহি দ্বিজ চণ্ডীদাসে শব্দ যায় আকাশে
মুনীন্দ্র মুরছি পড়ে যাতে।
সে ধ্বনি নারীর কানে হানয়ে মরম স্থানে
কেমনে সে ধরিবেক চিতে॥ ১৪০॥

সই আর যে কহিব কত।
আপনা খাইনু ছাড়িতে নারিনু
হইতে নারিনু রত॥
ঝাঁপ যে দিয়া জলেতে পশিয়া
যমুনায় থাকিব মরি।
গোঠেতে যাইতে ধেনু চড়াইতে
সেখানে দেখিবে হরি॥
এখনি তখনি বচন দুখানি
পরিমাণ কিছু নয়।
কহিতে কহিতে সোণা যে বরিখে
রঙ্গের তুলনা নয়॥
ধাঙড় চতুর চোর যে ঢিঠ
সব যে মিছাই কয়।

তাহার অধিক দ্বিগুণ চাতুরী
ঢিঠ ঢঙ্গেতে কয় ॥
এমতি নাগর গুণের সাগর
এমতি বচন তার।
এমতি বচনে করিয়া প্রমাণে
কেবা কোথা হৈল পার ॥
চণ্ডীদাসে কয় ক্রোধে যেবা হয়
সেইত এতেক কয়।
আপনা বুঝি মনেতে সম্বরি
মনের মনেতে রয়। ১৬৩ ॥

কর্ণাট রাগ

পিরিতি লাগিয়া আমি সব তেয়াগিনু।
তবুত শ্যামের সনে গোঁয়াতে নারিনু ॥
বিধিরে কি দিব দোষ আপন করম।
কি ক্ষণে করিনু প্রেম না জানি মরম ॥
ঘরে পরে বাররে কুলটা হৈল খ্যাতি।
কানু সনে প্রেম করি না পোহাল রাতি ॥
চল চল ওলো সই ওঝার বাড়ি যাই।
কালকূট বিষ আনি হাতে তুলি খাই ॥
পিরিতি মূরতি লাগি যেবা করে আশ।
পিরিতি লাগিয়া মরে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ ১৭৪ ॥

তথা রাগ।

সাঁজে নিভাইল বাতি কত পোহাইব রাতি
গুণ গণি হৃদয় বিদরে।
না হয় মরণ না রহে জীবন
মরম কহিব কারে ॥
সই কিছিল আমার করমে।
রোপিল কলপ লতা না হ'ল তাহার পাতা
শুখাইয়া গেল এই ঠামে ॥
জনম অবধি, ক্ষীর নীরে করি
সিঞ্চিলাম লতা মূলে।
ক্ষীরের গরিমা নীরের সীমা
হরিয়া লইল অনলে ॥
যাহার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
মন হৈল বনবাসী।

চণ্ডীদাসে কয় তাহার কি ঘাটি হয়
পরশে করিবে খুসি ॥ ১৭৫ ॥

তথা রাগ

কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এবড়ি মরমে বড় ব্যথা।
যে খানে সেখানে যাই সদাই শুনিতে পাই
কানে কানে ওনা কয় কথা ॥
দারুণ লোকে বলে মোরে কালা পরিবাদ।
তাহার বরণ ভ্রমে জলদ শ্যামের সনে
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ ॥
যমুনা সিনানে যাই আঁখি তুলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্ব তলা পানে।
যেখানে সে খানে আমি বাঁশীটি শুনিলে গো
দুটি হাত দিয়া থাকি কানে ॥
চণ্ডীদাসে কহে সদাই অন্তরে বহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
জপিতে জপিতে হরি তনু মন করে চুরি
না চিনিলাম কাল কি গোরা।" ১৭৬ ॥

মরি মরি যাই শ্যামের বাঁশিয়া নাগরে।
কুলছাড়া বাঁশীটি কলঙ্ক হইল মোরে ॥
নিতি নিতি ডাকে বাঁশী রহিতে নারি ঘরে।
মরম সন্ধান দিয়ে হৃদয় বিদরে ॥
যদি বা বাজাবে বাঁশী না হও ত্রিভঙ্গ।
কুলবতীর কুল বর্ণ না করিও ভঙ্গ ॥
শাশুড়ী খুরের ধার ননদীর জ্বালা।
মরমের মরম ব্যথা নাহি জানে কালা ॥
কালা কালা বলিয়া আসএ জগত জনে।
চরণে শরণ নিলাম না বাসিহ ভিন।
একেতে অবলা জাতি পরের অধীন।
নিরমল কূল ছিল তাহে দিনু কালি।
হাতে তুলে মাথে দিনু কলঙ্কের ডালি ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে শুন রাজার ঝি।
বাঁশীয়া দংশিল তোমা আমি করি কি ॥ ১৮৩ ॥

উদ্যানের প্রতি।

দুয়ারের আগে ফুলের বাগান
কিসেরে লাগিয়া রুইনু।

মধু খাই খাই ভ্রমরা মাতাল
বিরহ জ্বালায় মনু ॥
যূহি রুইনু জাতি রুইনু
রুইনু সগন্ধি মালতী।
ফুলের বাসে নিঁদ না আইসে
নিঠুর পুরুষ জাতি ॥
কুসুম তুলিয়া বোঁট তেয়াগিয়া
সেজ বিছাইল ক্ষেনে।
যদি শুই তায় কাঁটা ভুকে গায়
রসিক নাগর বিনে ॥
রতন মন্দিরে সখির সহিতে
তা সঙ্গে করিলাম প্রেম।
চণ্ডীদাসে কহে কানুর পিরিতি
যেন দরিদ্রের হেম ॥ ১৮৪ ॥

ঐ হের সই তাহার বিষম নারা।
কিছু নাহি খায় সে তেজয়ে কায়
পাঁজর হৈয়াছে সারা ॥
শুনি কিনা শুনি যেন সরু বাণী
যেন রুধিরের ধারা।
কনক বদন হৈয়াছে মলিন
চকিত লোচন তারা ॥
শ্রবণ নয়ন করে অনুক্ষণ
যেনক শায়ন ধারা।
নেতের বসনে মুছিবে কেমনে
এত বল আছে কার ॥
এখন তখন তাহার জীবন
না চলে কণ্ঠের নালা।
চণ্ডীদাসে কহে তুরিতে চলহ বালা ॥ ১৮৬ ॥

রাগ বালা ধানশী।

বিরহ জ্বরের তাপে ছল ছল আঁখি।
রাইকে বেড়িয়া কাঁদে কত শত সখী ॥
রাই তোর যেন কাঁচা সোণা।
ভূমে পড়ি গড়ে যাইছে যেন চাঁদের কণা।
চমকি শ্যামের নামে রাই উঠে কত বেরি।
ধূলায় লোটায় যেন সুগন্ধি করবী ॥

কহিতে কহিতে চিতে হৈলা অচেতন।
রাই মুরছিত কাঁদে আর সখীগণ ॥
কহে কবি চণ্ডীদাস বিরহ বেদন।
এমন বিরহ কেমনে রহে এজীবন ॥ ১৮৭ ॥

দেশ বড়াড়ি রাগ।

ধিক্ রহু কুলবতী কুল তেয়াগিয়া।
মরয়ে খলের সঙ্গে লেহ বাড়াইয়া ॥
বিকল চাঁচর কেশ বেশ খোয়াইয়া।
ধূলায় ধূসর কাঁদে নিশি পোহাইয়া ॥
জাতিকুল শীল দোষে আর গুরুজনা।
কাহারে না কহে সেই মরম বেদনা ॥
কে তোর মরমী আছে মরমে পশিয়া।
মরম বেদনা তার লইবে বাঁটিয়া ॥
চণ্ডীদাসে কহে সেই বেদনা জানিয়া।
পিরিতি বেয়াধি রহে মরমে লাগিয়া ॥ ১৮৮ ॥

ও পারে বধূর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখি হয়ে উড়ে যেতে পাখা না দেয় বিধি ॥
যমুনাতে ঝাঁপ দিব না জানি সাঁতার।
কলসে কসে ছিঁচ না ঘুচে পাথার ॥
মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
সাধ করে বড়ই গো কানু দেখিবারে ॥
আর কি গোকুলচাঁদ না করিব কোলে।
হাতের পরশমণি হারাইনু হেলে ॥
আগুনে দিই ঝাপ আগুন নিভাই।
পাষাণেতে দিই কোল পাষাণ মিলায় ॥
তরু তলে যাই যদি সেহ না দেয় ছায়া।
যার লাগি মুঁই সে হইল নিদয়া ॥
কহে রতু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে।
ছট্ ফট্ করে প্রাণ বঁধূ নাহি ঘরে ॥ ১৯২ ॥

সখি কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুইলে সিনান করিয়ে
সে মোরে দেখিয়ে হাঁসে ॥

কার শিরে হাত দিয়া।
কদম্ব তলাতে কি কথা কহিলে
যমুনার জল ছুঁয়া॥
মোর বৃন্দাবন আছে সাথি।
আর এক হয় যদি মনে লয়
কপোত নামেতে পাখী॥
একথা কহিও তারে।
সে গুণ ঝুরিয়া যে জন মরিবে
সে বধ লাগিবে তারে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভনে।
যাহার লাগিয়ে যে জন মরয়ে
সে তারে পাসরে কেনে॥ ১৯৩॥

তথা রাগ।

নিরবধি শ্যাম ভাবনা মোর মনে।
শ্রীঅঙ্গ সঙ্গম বিরলে চিন্তই
মরম সখির সনে॥
কদম্ব তলায় বিনোদ নাগর
তাহে চিত্ত গেল বাঁধা।
মনমথ জ্বরে হিয়া জর জর
গুমরি কাঁদয়ে রাধা॥
কমল নয়নে কাজর লেখা
কালার মূরতি লেখি।
ভালে সে সিন্দুর আঁখি নিরখিয়া
তাহার মূরতি দেখি॥
অসিত বরণ পরয়ে কখন
করে কুবলয় দাম।
মণি মরকত মালায় সতত
জপয়ে শ্যামের নাম॥
এমনি নিতি নিতি বঁধুর পিরিতি
অবলা কতেক সয়।
কহে চণ্ডীদাস এমন পিরিতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায়॥ ১৯৪॥

স্বপ্নরস উদ্গার। যথা রাগ।

চলহ সই জল ভরিতে যাই।
যে ঘাটে চন্দন চুয়া ভাসে।

কলসী ভাঙ্গিয়া ঝিকটি খেলিব
যাবত কৃষ্ণ না আইসে॥
এসহ সকল সখি বৈসহ আমার কাছে
স্বপন কহি যে তোমার আগে।
নিশি দ্বিপ্রহরে স্বপন দেখিনু
বঁধূয়া শিয়রে জাগে॥
শিয়রে বসিয়া ঈষৎ হাসিয়া
গায়েতে বুলায় হাত।
সূতার সঞ্চার দ্বার নাইক নড়ে
কোন পথে গেলা প্রাণনাথ॥
ডাহুকী ডাকয়ে কোকিল কুহরে
চকর ছাড়য়ে নিশ্বাস।
বাশুনী চরণ শিরেতে বন্দিয়া
কহে রতু চণ্ডীদাস॥ ১৯৫॥

যথা রাগ।

প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহি যে তোমারে।
বসিয়া কদম্ব তলে সে কানু করিছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥
অঙ্গে দেই চন্দন বলেন ধর বচন
আর বার (?) বাঁশী সুমধুরে।
চাহিলেন * * নাহি দিল পাপ মতি
দেখিল কৃষ্ণ দৌজি পহরে (?)॥
তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিনু সে চাঁদ বদনে।
ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মেরে নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে॥
চতুর্থ প্রহরে কাল করিল অধর পান
মোর ভেল বড় আগো আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল আমার নিঁদে
রস গাইল রতু চণ্ডীদাসে॥ ১৯৬॥

তথা রাগ। ইতি মিলন ॥

পিরিতি করিয়ে ভাঙ্গয়ে যে !
সাধন অঙ্গ না পায় সে ॥
রাগ সাধনের এমতি রীত।
সে পথি জনের তেমতি চিত ॥
সকল ছাড়িল তাহার তরে।
তাহারে ছাড়িতে সাধ যে করে ॥
আদি চণ্ডীদাস চারি সে বুঝান।
মূঢ় উঠাইল জানন মান (?) ॥ ১৯৭ ॥

(ক্রমশঃ)।

স্বর্ণ মেডেল ও সর্ব্বোচ্চ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।
মেওরেস।

মেওরেস সেবনে বিংশতি প্রকার মেহ, পুরুষত্ব হানি, শুক্রক্ষয়, অস্বাভাবিক উপায়ে রেতঃপাত, অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বা অধিক বীর্য্যক্ষয়নিবন্ধন শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবকালীন জ্বালা ও তৎসঙ্গে তূলার আঁশের মত কিম্বা খড়ি গোলার ন্যায় বিকৃত বীর্য্যপতন, অতিরিক্ত প্রস্রাব, হস্ত পদ জ্বালা, মাথা ঘোরা, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ খুব শীঘ্র সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ইহা সেবনে শত শত চিকিৎসক-পরিত্যক্ত রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে, শক্তি, স্বাস্থ্য ও পুরুষত্ব ফিরিয়া পাইয়াছে। মেওরেস দেখিতে মনোহর, খাইতে প্রীতিপ্রদ, গুণে অমৃত তুল্য। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা মাত্র। ভিঃ পিঃ তে লইলে এক হইতে তিন শিশি পর্য্যন্ত আট আনা ডাক মাশুলাদি লাগে। পত্র লিখিলেই বিস্তৃত সুখ্যাতি পত্র সম্বলিত মূল্য তালিকা পাঠাই। পত্রাদি লিখিবার একমাত্র ঠিকানা :—

ম্যানেজার,
ভিক্টোরিয়া, কেমিক্যাল ওয়ার্ক্‌স,
রাণাঘাট, (বেঙ্গল)

বীরভূমি।

৩য় ভাগ] ভাদ্র, ১৩০৯। [৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

শাস্ত্রোক্ত বলিদান-রহস্য।

মানবগণের হিংসা-প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার পক্ষে শাস্ত্রোক্ত বলিদান ব্যবস্থার ন্যায় সুন্দর সুব্যবস্থা বোধ হয়, আর হইতেই পারে না। অতএব আমরা এই প্রবন্ধে পাঠকগণকে বলিদানের রহস্য বুঝাইবার নিমিত্ত যত্ন করিব।

বেদমূলক সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্র সকল, মানবগণের প্রকৃতিভেদেই উপাসনা-ভেদ করিয়াছেন। সমগ্র মানবমণ্ডলী সাধারণতঃ ঐ প্রকৃতি-ভেদেই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যথা সাত্ত্বিক প্রকৃতিক, রাজস-প্রকৃতিক ও তামস-প্রকৃতিক। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ভাগবৈষম্যেই ঐ প্রকার প্রকৃতি-ভেদ ঘটিয়া থাকে। যে সমস্ত মানব-শরীরে সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকে, তাহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতিক; যাহাদের দেহে রজোগুণের আধিক্য বিদ্যমান, তাহারা রাজস ও তমোগুণ-প্রধান দেহধারী জীবকেই তামস-প্রকৃতিক বলে। জীবদেহে গুণবৈষম্য ঘটিবারও নানা কারণ থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান কারণই হইল, জীবের পূর্ব্বপূর্ব্ব-জন্ম-সঞ্চিত কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট। এতদ্‌ব্যতীত পিতৃমাতৃগুণ, দেশ-কাল-পাত্রের অবস্থা এবং জন্মকালীন চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি-বৈচিত্র্য ও প্রভাববশতঃও গুণবৈষম্য বা প্রকৃতি-ভেদ ঘটিয়া থাকে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ কাহাকে বলে ও তাহার ক্রিয়া-প্রণালী, গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বীরভূমিতে প্রকাশিত "ব্রহ্মতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক সৃষ্টিবিবরণ" নামক প্রবন্ধে আমরা যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং এই স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই প্রবন্ধ পাঠের সময় পাঠকগণ সেই স্থানটী একবার দেখিয়া লইবেন। ফলতঃ গুণ-ভেদে মানব-প্রকৃতি যেমন ত্রিবিধ, তদ্রূপ উপাসনা-পদ্ধতিও প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন। যিনি যে প্রকৃ-

ISSUE(S) MISSING

তির লোক, তিনি সেই প্রকৃতির সহিত মিশিয়াই ভগবানের উপাসনা করিবেন। অর্থাৎ সাত্ত্বিক লোক সাত্ত্বিক-ভাবে রাজসিক লোক রাজসভাবে ও তামসিক লোক তামস-ভাবে উপাসনা করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। প্রকৃতিবিরুদ্ধ উপাসনা কখন কল্যাণদায়িনী হয় না। কেন না ত্রিগুণময়ী মহামায়ার মায়ায় অভিভূত সংসারী জীবের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্যে আদৌ প্রবৃত্তি বা অনুরাগ জন্মিতেই পারে না।

ভগবদুপাসনার মূল উপকরণই হইল, একমাত্র ভক্তি। ভক্তি একটী ভাববিশেষ এবং কেবল মনের সহিতই তাহার সম্বন্ধ। মানস-প্রত্যক্ষ বা অন্তরে অন্তরে নিজে অনুভব করা ব্যতীত, কেবল ভাষার দ্বারা ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ অথবা সেই আনন্দময় ভাবটী প্রকৃতরূপে অভিব্যক্ত হয় না। ভক্তিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

শাণ্ডিল্য সূত্রম্।

ঈশ্বরে পরা আনুরক্তির নামই ভক্তি। কৃপণ ব্যক্তির সঞ্চিত ধনের প্রতি যেরূপ আসক্তি, স্ত্রৈণব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি যেরূপ আসক্তি, সেইরূপ আসক্তি ভগবানে হইলেই তাহা ভক্তিপদবাচ্য হয়। সৌভাগ্যক্রমে সাধকের অন্তঃকরণে যখন পরা-ভক্তির উদয় হয়, তখন আর তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না; তিনি ভগবানের সহিত এক হইয়া যান।

ভক্তি, প্রেম ও স্নেহ স্বরূপতঃ একই পদার্থ। কেবল পাত্র-ভেদে সংজ্ঞা-ভেদ মাত্র। এ তিনেরই অর্থ, আত্মবোধ বা অন্তরের সহিত ভালবাসা। আমরা লোকব্যবহারে দেখিতে পাই, সংসারী ব্যক্তিমাত্রই নিজের প্রিয়বস্তু স্ত্রীপুত্রাদি প্রিয়জনকে ভোগ করাইতে পারিলেই, আনন্দিত হয়—তৃপ্তিলাভ করে। অর্থাৎ সেই বস্তু নিজে ভোগ করিলে যেরূপ আনন্দ, যেরূপ তৃপ্তি হইত, প্রিয়জনের ভোগেও তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কেন এমন হয়? স্ত্রীপুত্রাদি প্রিয়জনে লোকের আত্মবোধ অর্থাৎ নিজের আত্মা হইতে তাহাদের আত্মা অভিন্ন, এইরূপ জ্ঞান থাকে বলিয়াই তাহাদের ভোগে ঐরূপ আনন্দ ও তৃপ্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিলেই আর সেরূপ আনন্দানুভূতি হয় না। এখানে লোকব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, ইহা লৌকিক প্রেম বা স্নেহের লক্ষণ মাত্র। ভগবদ্ভক্তি এই আকারের হইলেও ইহা অপেক্ষাও উচ্চাঙ্গের বস্তু। ভগবানের সহিত একাত্মতা

লাভই ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য। এই জন্যই শাস্ত্রে উপাস্য-দেবতাকে অভেদ জ্ঞানে অর্চ্চনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

"শিবো ভূত্বা শিবং যজেৎ"

নিজে শিব হইয়া শিবপূজা করিবে।

"কালিকামাত্মবৎ পশ্যেৎ তথা সেবেত চাত্মবৎ॥"

কালিকাকে (ভগবানকে) আত্মবৎ অর্থাৎ নিজ প্রকৃতির অনুরূপে চিন্তা করিবে। ও আপনার মতই সেবা করিবে। আবার শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন;—

"যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥"

যাহা সাধারণতঃ প্রিয় ও নিজের যাহা প্রিয় বস্তু, ভগবদুপাসনার সময় তাহাই তাঁহাকে উপচার দিতে হইবে। নিজের প্রিয় বস্তু সাধারণের অপ্রিয় হইলেও তাহাও দিবে। বলা বাহুল্য যে, যে সমস্ত বস্তু সাধারণতঃ অনিষ্টজনক ও পবিত্রতার হানিকারক বলিয়া শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ পলাণ্ডু ও লসুন প্রভৃতি দ্রব্য, নিজের প্রিয় হইলেও অবশ্যই তাহা দেবতাকে দেওয়া যাইতে পারে না। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

"নাভক্ষ্যং দদ্যান্নৈবেদ্যম্।" বিষ্ণুসংহিতা।

যে বস্তু নিজের ভক্ষণীয় নহে, এমন বস্তু ভগবানকে নৈবেদ্য (উপচার) দিবে না। উপচার প্রদানকালে ভগবান কেবল সাধকের ভাবের প্রতিই লক্ষ্য করেন; কিন্তু নিবেদ্য উপচার দ্রব্যের প্রতি নহে। কেন না তিনি যে "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।"

আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সকল কথার আলোচনা করিলাম, তাহার ফলিতার্থ এই দাঁড়াইল যে, ভগবানকে ভক্তি করিতে হইলে,—ভালবাসিতে হইলে, যিনি যে প্রকৃতির লোক ও যাঁহার যাহা প্রিয় বস্তু, তিনি সেই ভাবেই ভগবানের উপাসনা করিবেন এবং সেইরূপ বস্তুই উপচার দিবেন।

কিন্তু সংসারে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা সকলেরই সমভাবে প্রীতিকর হইবে। আমার যাহা প্রিয়, তোমার পক্ষে তাহা অপ্রিয়; আবার তোমার যাহা প্রিয়, অন্যের পক্ষে তাহা অপ্রিয়। বস্তুতঃ কেবল প্রকৃতিভেদেই ভিন্ন ভিন্ন মানবের ভিন্ন ভিন্ন রসযুক্ত আহারীয় পদার্থে প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে আহারীয়

পদার্থও ত্রিবিধ। সত্ত্বগুণাধিক লোকের সাত্ত্বিক আহার, রজোগুণাধিক লোকের রাজসিক ও তমোগুণাধিক লোকের তামসিক আহারই প্রিয় হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥"

ভগবদ্‌গীতা।

যে সকল আহারীয় পদার্থ আয়ু, চিত্তের স্থৈর্য্য, বল, আরোগ্য অকৃত্রিম সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধন করে, যাহা সুরস ও সুস্নিগ্ধ, যাহার ক্রিয়া অনেক সময় পর্য্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয় এবং যাহা হৃদ্য (কোন প্রকার বিকট বা উগ্র গন্ধযুক্ত নহে) তাদৃশ আহারই সাত্ত্বিক লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণরসযুক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ ও অতি বিদাহী (অত্যন্ত উত্তাপবর্দ্ধক) এবং যে সকল আহার দুঃখ, শোক ও আময়ের (ব্যাধি) বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই সকল আহারই রাজসিক লোকের প্রিয় হয়। আর যে সকল আহারীয় দ্রব্য অর্দ্ধপক্ক, বিরস (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়াছে) পূতি (পচা) পর্য্যুষিত (বাসি) উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট) ও অমেধ্য (অপবিত্র) তাহার নাম তামসিক আহার এবং তামসপ্রকৃতিক লোকেরই তাহা প্রিয় হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে মৎস্য ও মাংস সাধারণতঃ রাজসিক আহারের পর্য্যায়ে স্থান পাইলেও অবস্থাভেদে তাহা তামসিক আহার ও তামসপ্রকৃতিক লোকেরও প্রিয়। অতএব শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়তঃই প্রতিপন্ন হইল যে, মৎস্য-মাংসপ্রিয় রাজস ও তামস অধিকারীমাত্রই শাস্ত্রানুমোদিত পবিত্র মৎস্য মাংস দ্বারাই ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন, এবং তাঁহাদের জন্যই শাস্ত্রে ব্যবস্থা হইয়াছে,—

"বিনা মৎস্যৈর্ব্বিণা মাংসৈনার্চ্চয়েৎ পরদেবতাম্।"

মৎস্যমাংস ব্যতীত দেবতার অর্চ্চনা করিবে না। আবার শাস্ত্রান্তরেও কথিত হইয়াছে,—

"রাজসো বলিরাখ্যাতো মাংস-শোণিত-সংযুতঃ।"

রাজসপ্রকৃতিক লোকেরা মাংসশোণিতযুক্ত বলিই দেবতাকে অর্পণ করিবেন।

কিন্তু যাঁহারা সাত্ত্বিকপ্রকৃতিক, মৎস্য ও মাংস তাঁহাদের পক্ষে একবারেই অপ্রিয়। সুতরাং বলিদানে তাঁহাদের অধিকার নাই। সাত্ত্বিকপ্রকৃতিক দিগের উপচার-দান বিষয়ে শাস্ত্রে নিম্নলিখিত রূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

"সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।"

সাত্ত্বিক সাধকেরা জপ, যজ্ঞাদি ও নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারাই ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। কেন না তাহাই যে তাঁহাদের প্রিয়বস্তু।

সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস অধিকারী কাহাকে বলে ও তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ কি, এক্ষণে তাহাই কথিত হইতেছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

ভগবদ্‌গীতা।

জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা এই তিনটী লইয়াই কর্ম্মের বিধি। আর করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, এই তিনটীই কর্ম্মের আশ্রয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, সত্ত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধ। যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহের মধ্যে সর্ব্বস্থানব্যাপক এক অব্যয় পরমাত্ম তত্ত্বরূপ ভাবের উপলব্ধি হয়, তাহার নাম "সাত্ত্বিক জ্ঞান।" যে জ্ঞান দ্বারা পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ তুমি, আমি, জগৎ পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া ধারণা হয়, তাহাই রাজসজ্ঞান। আর যে জ্ঞানের উদয় হইলে, কোন একটী দৃশ্য পদার্থকে পরমাত্মা বলিয়া উপলব্ধি হয়, এবং যাহা অযৌক্তিক ও অযথার্থ জ্ঞান, তাহারই নাম তামসজ্ঞান। কামনারহিত পুরুষ রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত হইয়া অনাসক্ত ভাবে যে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই "সাত্ত্বিককর্ম্ম"। ফলকামনা করিয়া বা অহঙ্কারবশে কোন ব্যক্তি কষ্টসাধ্য কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহাকে "রাজসকর্ম্ম" বলা যায়। আর ভাবী শুভাশুভ, ধনক্ষয়, হিংসা ও নিজের সামর্থ্যাদি বিচার না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই "তামসকর্ম্ম" নামে কথিত হইয়া থাকে। ফলকামনাশূন্য, অনহংবাদী, ধৃতিমান্, উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতেও যিনি নির্ব্বিকার চিত্ত, তিনিই "সাত্ত্বিককর্ত্তা"। যে ব্যক্তি ঘোর বিষয়ানুরাগী, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুব্ধচিত্ত, হিংসাপরায়ণ, অশুচি ও হর্ষ-শোকযুক্ত, তাহার নাম "রাজসকর্ত্তা"। আর যে ব্যক্তি অসাবধান, অবিবেকী, উদ্ধতস্বভাব, শঠ, পরাপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী, সেই লোকই "তামসকর্ত্তা"। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন যে,—

"অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষ্যতে॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ-পূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥"

ভগবদ্‌গীতা।

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া 'অবশ্যকর্ত্তব্য' বোধে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম সাত্ত্বিকযজ্ঞ। কোন প্রকার ফলকামনা করিয়া অথবা দম্ভবশে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা রাজস। আর বিধিহীন, মন্ত্রহীন, অন্নদানহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধাবিহীন যে যজ্ঞ, তাহাই তামসযজ্ঞ নামে কথিত হইয়া থাকে। দেব, দ্বিজ, গুরু ও জ্ঞানীগণের পূজা, শৌচ, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা, এই গুলি কায়িক তপস্যা। যাহাতে কাহারও উদ্বেগ না হয়, এই প্রকার সত্য, প্রিয় ও হিতজনক বাক্যপ্রয়োগ এবং বেদাভ্যাস, এই গুলি বাচিক তপস্যা। আর চিত্তপ্রসাদ, অক্রূরতা, আত্মচিন্তা, মনঃসংযম ও অকপটতা, ইহারই নাম মানসিক তপস্যা। এই ত্রিবিধ তপস্যা ফলকামনাশূন্য হইয়া, পরম শ্রদ্ধা সহকারে একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠিত হইলে, সাত্ত্বিক তপস্যা নামে কথিত হয়। প্রশংসা, সম্মান, ও অর্থাদিলাভের উদ্দেশে

এবং দম্ভবশতঃ যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাজস, রাজস তপস্যা অস্থির এবং তাহার ফলও ক্ষণভঙ্গুর। আর মোহজনিত দুষ্ট আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মপীড়ন সহকারে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, অথবা পরের অনিষ্টসাধনই যে তপস্যার উদ্দেশ্য, তাহাই তামস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পবিত্র দেশে, পবিত্র কালে,সৎপাত্রে নিষ্কামভাবে"অবশ্য কর্ত্তব্য"বোধে যে দান করা যায়, তাহার নাম সাত্ত্বিক দান। প্রত্যুপকারের আকাঙ্ক্ষায় বা প্রত্যুপকার করিবার জন্য অথবা পারলৌকিক ফল উদ্দেশে যে দান করা যায়, সেই ক্লেশযুক্ত দানকে রাজসিক দান বলে। আর অদেশে, (কর্ম্মভূমির বাহিরে, ম্লেচ্ছাদি দেশে) অবিহিত কালে, অপাত্রে, আনাদর বা তিরস্কার সহকারে যে দান করা যায়, তাহাই তামসদান নামে কথিত হইয়া থাকে।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোক কাহাকে বলে ও তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ, পাঠক! শাস্ত্রবাক্যে শুনিলেন ত? বস্তুতঃ কোন্ ব্যক্তি কোন্ প্রকৃতির লোক, তাহা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারেই সকলে স্থির করিয়া লইতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে, কলিপ্রাবল্যের এই ঘোর দুর্দ্দিনে প্রকৃত সাত্ত্বিক লোক সমগ্র ভারতবর্ষে, অন্ততঃ গৃহস্থমণ্ডলীতে একবারে দুর্লভ বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই মনে হয়, দুই দশ জন রাজসিক ব্যতীত এখনকার প্রায় লোকই তামসপ্রকৃতিক। সুতরাং বৈধ বলিদানে সকলেই সমান অধিকারী। শাস্ত্রোক্ত বলিদান-বিধি কোন নির্দ্দিষ্ট উপাসক সম্প্রদায় অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট দেবতার অর্চ্চনোপলক্ষে ব্যবস্থিত হয় নাই। রাজস ও তামস প্রকৃতির লোকমাত্রই সমস্ত উপাস্য-দেবতার নিকট বলিপ্রদান করিতে পারেন। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর রাজসিকী ও তামসিকী পূজাতেও বলিদানে অধিকারী। তবে দেবতাবিশেষে বলিযোগ্য পশু নির্ব্বাচনে শাস্ত্রে কিছু কিছু ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুর বলিদানে মৃগ, শশ ও ছাগপশুই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ত্রৈবার্ষিক কৃতক্লীব, (খাসি) বৃদ্ধ ও শ্বেতবর্ণ ছাগই বিষ্ণুর বলিদানে প্রশস্ত।

আধুনিক বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক মহাশয়গণ পূর্ব্বসঞ্জাত কুসংস্কারবশে আমাদের এই উক্তিকে হয় ত প্রলাপোক্তি বলিয়াই মনে করিবেন, এবং বিষ্ণুর নিকট খাসি বলিদানের কথা শুনিয়া, কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষেই ইহা আমাদের কপোল-কল্পিত কথা নহে—ইহা শাস্ত্রের কথা। বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

"মার্গং মাংসং তথা ছাগং শাশং সমনুগৃহ্যতে।
এতানি মে প্রিয়াণি স্যুঃ প্রযোজ্যানি বসুন্ধরে॥"

বসুন্ধরার প্রতি ভগবদ্‌বাক্য।

ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং বলিতেছেন,"বসুন্ধরে! মৃগ-মাংস, ছাগ-মাংস ও শশক-মাংস আমার বড়ই প্রিয়। অতএব তাহাই আমাকে প্রদান করিবে।" আবার তন্ত্র বলিয়াছেন,—

"ত্রৈবার্ষিকঃ কৃতক্লীবঃ শ্বেতো বৃদ্ধো হ্যজাপতিঃ।
বার্দ্ধীনসঃ স বিজ্ঞেয়ো মম বিষ্ণোরতিপ্রিয়ঃ॥"

নিরুত্তর তন্ত্র।

তিন বৎসর বয়স্ক কৃতক্লীব, (খাসি) শ্বেতবর্ণের বৃদ্ধ ছাগের নাম বার্দ্ধীনস। এই বার্দ্ধীনস আমার (বিষ্ণুর) বড়ই প্রিয়।

ফলকথা, বিষ্ণুর রাজসী বা তামসী পূজাতে বলিদানের নিষেধ কোথাও নাই। যদি কোন স্থানে সেই প্রকার নিষেধবাক্য থাকে, তাহা সাত্ত্বিকী পূজোপলক্ষেই বুঝিতে হইবে। কেন না যখন ভিন্ন ভিন্ন দেবমূর্ত্তি সকল একই ঈশ্বরের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, তখন বেদমূলক সনাতন আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র সকলে উক্তরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থা থাকা, কখনই সম্ভবপর নহে। প্রকৃত পক্ষে বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলিদান নিষিদ্ধ হইলে, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, অশ্ব-বলি দ্বারা কখনই যজ্ঞকার্য্য সমাধা করাইতেন না। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব যে পরম বৈষ্ণব, একথা মহাভারত-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন।

আরও এক কথা আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত একখানি বৈষ্ণব-প্রধান গ্রন্থ। ঐ ভাগবতের নবম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্বিজগণকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানচ্ছলে যে ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, প্রয়োজনবোধে ও পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। এই উদ্ধৃত অংশ দ্বারাই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, যজ্ঞে পশুবধ কখনও বৈষ্ণব-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। যথা,—

" স একদাষ্টকাশ্রাদ্ধে ইক্ষ্বাকুঃ সুতমাদিশৎ।
মাংসমানীয়তাং মেধ্যং বিকুক্ষে গচ্ছ মা চিরম্॥
তথেতি স বনং গত্বা মৃগান্ হত্বা ক্রিয়ার্হণান্।
শ্রান্তো বুভুক্ষিতো বীরঃ শশকাদদপস্মৃতিঃ॥

শেষং নিবেদয়ামাস পিত্রে তেন চ তদ্‌গুরুঃ।
চোদিতঃ প্রোক্ষণামাহ দুষ্টমেতদকর্ম্মকম্॥
জ্ঞাত্বা পুত্রস্য তৎকর্ম্ম গুরুণাভিহিতং নৃপঃ।
দেশান্নিঃসারয়ামাস সুতং ত্যক্ত বিধিং রুষা॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, একদা মহারাজা ইক্ষ্বাকু মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবার জন্য রাজপুত্র বিকুক্ষিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, বিকুক্ষে! যাও পবিত্র মাংস আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না। বিকুক্ষি রাজাদেশ প্রাপ্তিমাত্রই বনগমন করিয়া ক্রিয়াযোগ্য বহুতর মৃগ বধ করিলেন। কিন্তু তৎকালে তিনি এরূপ শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পিতার অষ্টকা শ্রাদ্ধের কথা ভুলিয়া গিয়া, তন্মধ্য হইতে একটা শশক ভক্ষণ দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। তাহার পর, তিনি অবশিষ্ট মাংস সকল পিতৃসমীপে আনিয়া উপস্থিত করিলে, মহারাজ ইক্ষ্বাকু সেই মাংসের শ্রাদ্ধোচিত সংস্কার করিবার নিমিত্ত কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবকে অনুরোধ করিলেন। মহামুনি বশিষ্ঠ ধ্যানবলে রাজপুত্রের শশক ভক্ষণের কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন যে "এই মাংস দূষিত হইয়াছে—ইহা কর্ম্মার্হ হইবে না।" তাহার পর রাজা রোষবশতঃ রাজপুত্র বিকুক্ষিকে দেশ হইতে একবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। কেন না শ্রাদ্ধীয় মাংসের অগ্রভাগ গ্রহণ করাতে তাঁহার সদাচার পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্ববর্ণিত মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধরূপ পিতৃযজ্ঞ, বর্ষে বর্ষে মাঘমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে সম্পন্ন করিতে হয়, এবং ইহা গৃহস্থাশ্রমী দ্বিজগণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতি "দ্বিজ" শব্দে কথিত হইয়া থাকেন) পক্ষে শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য, এই পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ভুক্ত দ্বিজগণই ঐ শ্রাদ্ধ না করিলে, প্রত্যবায়ভাগী হইয়া থাকেন।

আমরা অতি দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সে মহাভারতের আমলের, সে পৌরাণিক কালের শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম আর এখন আমাদের দেশে প্রচলিত নাই। কালমাহাত্ম্যে সেই পবিত্র ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া এক্ষণে নানা শাখায় নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। প্রাচীনমতে শ্রদ্ধাশীল দুই দশ জন ব্যতীত, এখনকার প্রায় সমগ্র বৈষ্ণবসমাজই শাস্ত্রবিবর্জ্জিত, সদাচারপরাঙ্মুখ ও বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরের অবতারস্বরূপ ত্রিকালদর্শী; সর্ব্বজ্ঞ ঋষি-

গণের বাক্যে আর তাহাদের বিশ্বাস নাই। পয়রাদিছন্দে গ্রথিত, বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থ সকলই এখন তাহাদের শাস্ত্রস্থানীয় হইয়াছে। চোর, ডাকাইত, ও ব্যভিচারদোষদুষ্ট প্রভৃতি অসৎপথাবলম্বী ব্যক্তিগণের শেষজীবনে এই ধর্ম্মই এখন একমাত্র আশ্রয়স্থল। হাড়ি, মুচি, মেথর প্রভৃতি অস্পর্শীয় অন্ত্যজ জাতিরাও একবার ভেক লইয়া 'বৈষ্ণব' হইতে পারিলে, আর তাহাদের হীন-জাতিত্ব থাকে না। তখন তাহারা "বৈষ্ণব ঠাকুর" নামে অভিহিত ও বিপ্রবৎ পবিত্র জাতি হইয়া, পংক্তিভোজনে অধিকার পাইয়া থাকে। সুতরাং বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজ যে, দিন দিন অধঃপতিত ও কলুষিত হইয়া উঠিতেছে, সে পক্ষে সন্দেহমাত্র নাই। আবার ইংরেজিশিক্ষিত নব্যদলের মধ্যে নূতন আর এক সম্প্রদায় গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব দেখা দিয়াছেন। ইঁহারা হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মটাকে একবারে উঠাইয়া দিয়া সমাজকে একাকার করণে বদ্ধপরিকর। যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বিধর্ম্মীরাও ইচ্ছা করিলে, বৈষ্ণব হইতে ও সমাজে আশ্রয় লইতে পারে, ইহাই ইঁহাদের মত। ফলতঃ প্রকৃতিভেদে উপাসনাভেদ, ও অধিকার বিচারের কথাটা, এখন সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ হইতেই একবারে উঠিয়া গিয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, ইহা কলিপ্রাবল্যের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ একাকারেরই পূর্ব্বলক্ষণ। কলির প্রারম্ভ হইতেই এই দুর্লক্ষণ,—এই একাকারের লক্ষণ, ভারতে দেখা দিয়াছে। স্বয়ং ভগবান বুদ্ধাবতারে সর্ব্বপ্রথমে বেদবিহিত যজ্ঞ ও যজ্ঞে পশুবধের নিন্দা প্রচার করিয়া, লোকদিগের মোহোৎপাদনরূপ যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত ও সাম্যনীতির ফলস্বরূপ রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম ও অপরাপর প্রকার নানা উপধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়া, ক্রমে ক্রমে তাহার ফুল ফল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবান যে লোকমোহনার্থই বুদ্ধাবতার হইয়াছিলেন, একথা শাস্ত্রেও বর্ণিত আছে। মহাকবি জয়দেব বলিয়াছেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশবধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥"

দশাবতার বর্ণন।

মর্ম্মার্থ এই যে, হে হরে! হে জগদীশ! তুমি বুদ্ধশরীর ধারণ করিয়া,

বেদবিহিত যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছ এবং পশুবধে সদয়হৃদয়তা দেখাইয়াছ। অতএব তোমার জয় হউক।

বলিদানের রহস্য বুঝাইতে গিয়া, প্রসঙ্গক্রমে দুই একটা অবান্তর কথারও আলোচনা করিতে হইল। যাউক সে কথা। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়েরই অনুসরণ করা যাইতেছে। বলিদান বা যজ্ঞে পশুবধের বৈধতা প্রতিপাদন জন্য আমাদের আরও একটী শাস্ত্রীয় যুক্তিমূলক কথা বলিবার আছে। মানবগণ যে, অহরহঃ সংসার-জ্বালায় জ্বালাতন হইতেছে, অবিদ্যামূলক একমাত্র বিষয়াশক্তিই তাহার মূলকারণ। বিষয়াশক্তির ন্যায় ভয়ঙ্কর রিপু আর নাই। এক বিষয়াশক্তি হইতে মানবের কতদূর পর্য্যন্ত অধঃপতন বা সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় অতি সংক্ষেপে, অথচ পরিষ্কার ভাষায়, তাহা বুঝান হইয়াছে যথা,—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্‌ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, নিরন্তর বিষয়চিন্তা করিতে করিতে ক্রমেই তাহাতে আসক্তি জন্মে, এবং সেই আসক্তি হইতেই কামনার উদয় হয়। কামনা কোন কারণে প্রতিহত হইলে, তাহা হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ক্রোধ হইতে মোহ ; (অজ্ঞানতা) মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ ; স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং তাহার পরেই ঘোর অধঃপতন বা সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে।

বস্তুতঃ এই বিষয়াসক্তি হইতেই জীবের সংসারবন্ধন ঘটিয়া থাকে। সুতরাং যাবৎ জীবের মনোমধ্যে বিষয়াসক্তি থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি বা সংসার-বন্ধন হইতে পরিত্রাণের কোনই সম্ভাবনা নাই। সংসারী মানবমাত্রই প্রকৃতির অধীন—স্বভাবের অধীন এবং স্ব স্ব স্বভাবকর্ত্তৃকই সকলে পরিচালিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বিষয়াসক্তি যখন সেই প্রকৃতিসঞ্জাত একটা গুণবিশেষ, তখন তাহাকে পরিত্যাগ করাও ত সহজসাধ্য নহে! কেন না আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্যে কখনই জীবের প্রবৃত্তি বা অনুরাগ জন্মিতে পারে না। তবে এখন উপায়? উপায় অবশ্যই আছে। আমাদের মঙ্গলময় শাস্ত্রই বিষয়াসক্তি-নিবৃত্তির অতি প্রকৃষ্টতম উপায় উদ্ভাবিত করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"বিষয়াকৃষ্ট চিত্তস্য যন্মহৌষধ মুচ্যতে।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াপ্যবস্তূনাং ভগবত্যৈ সমর্পণম্ ॥"

অর্থাৎ যে বিষয়ে যাহার আসক্তি থাকে, সেই বিষয় দ্বারা শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের অর্চ্চনা করিতে করিতে ক্রমে সেই আসক্তি কমিয়া যায়। সুতরাং আসক্তিত্যাগের তাহাই একমাত্র মহৌষধ।

কথাটা পরিষ্কার করিবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেখাইব। মনে কর, স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে ছাগমাংস তোমার অতীব প্রিয় পদার্থ। সুতরাং তাহাতে তোমার বড়ই আসক্তি জন্মিয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে যদি তুমি নিজের রসনাতৃপ্তির কথা কিয়ৎকালের জন্যও ভুলিয়া গিয়া, ভক্তিযোগ সহকারে স্বকীয় উপাস্য দেবতার অর্চ্চনোপলক্ষে অথবা শ্রাদ্ধাদিরূপ পিতৃযজ্ঞে শাস্ত্রীয় বিধানমতে পশুহনন ও দেবাদিকে তাহা উৎসর্গ করিয়া দিয়া, অবশেষে নিজে প্রসাদ গ্রহণের নিয়ম করিতে পার, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তোমার মাংসাহার-লালসা ত সংযত হইবেই; তদ্ভিন্ন মাংসের প্রতি তোমার যে অনুরাগ ছিল, সেই অনুরাগ ভগবচ্চরণে সমর্পিত হইয়া, ভক্তিভাববশতঃ তাঁহার কৃপালাভেও সমর্থ হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়ম দ্বারা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুই চারি বারের বেশী মাংস ব্যতীত শাস্ত্রমতে অন্য বৃথা মাংস খাইবার ত কাহারও অধিকার নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"ভক্ষয়েৎ প্রোক্ষিতং মাংসং সকৃদ্‌ব্রাহ্মণ-কাম্যয়া।
দৈবে নিযুক্তঃ শ্রাদ্ধে বা নিয়মে তু বিবর্জ্জয়েৎ ॥"
যমঃ।

ব্রাহ্মণগণের কামনা হেতু ব্রাহ্মণভোজনরূপ যজ্ঞে অথবা দেবার্চ্চনা ও শ্রাদ্ধাদিরূপ পিতৃযজ্ঞে যে মাংস প্রোক্ষিত হয়, কেবল সেই মাংসই সকলে খাইতে পারেন। পরন্তু যিনি নিয়মী, অর্থাৎ মাংসাহার এককালীন ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য এ বিধি নহে। মাংসভোজন-বর্জ্জনকারির পুণ্যের সীমা নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি হয়মেধ-ফলং তথা।
গৃহেঽপি নিবসন্ বিপ্রো মুনির্মাংসস্য বর্জ্জনাৎ ॥"

যে বিপ্র মাংসত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ ও সকল কামনা পূর্ণ হয় এবং তিনি গৃহে বাস করিলেও মুনি। আবার মনু বলিয়াছেন,—

"বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি ন তু খাদেদ্ যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্॥"

যিনি বর্ষে বর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন, এবং যিনি মাংসাহার বর্জ্জন করিয়াছেন, এই উভয়ের পুণ্যফলে কিছু মাত্র ইতরবিশেষ নাই।

কিন্তু কেবল মাত্র উদরতৃপ্তির উদ্দেশে যে পশু হত হয়, অথবা দেবার্চ্চনার ভাণ মাত্র করিয়া, যে ব্যক্তি অবিধি পূর্ব্বক পশুহনন করে, সেই দুরাচার ঘোর নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, এবং হত-পশু-শরীরে যতগুলি রোম থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে নরকে বাস করিতে হয়। যথা,—

"বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্মিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্॥"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

অপ্রোক্ষিত বৃথা মাংসভোজনোপলক্ষে মনু আরও বলিয়াছেন,—

"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥"

অর্থাৎ বৃথা পশু-হননে অনুমতিদাতা, হত পশুর মাংসবিভাগকারী, স্বয়ং পশুহন্তা, মাংসক্রয়বিক্রয়কারী, মাংসপাককারী, মাংসপরিবেশক এবং মাংস-ভক্ষক এই সাত ব্যক্তিকেই ঘাতক বলা যায়।

পরন্তু যজ্ঞার্থে যে পশুবধ হয়, যাজ্ঞিকের তাহাতে হিংসা-পাপ হয় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কেবল যজ্ঞের নিমিত্তই পশুর সৃষ্টি করিয়াছেন। যজ্ঞের দ্বারাই জগৎ রক্ষা হয়। অতএব যজ্ঞে যে বধ, তাহা অবধ (অহিংসা) মধ্যেই পরিগণিত।

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ভূষণ্ডী রামায়ণ।

শ্রীশ্রীরাম।

অথ রামায়ণ লিখ্যতে।

বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র রঘুকুলবর।
নবদুর্ব্বাদল শ্যাম কিবা জলধর॥
বাম করে কোদণ্ড দক্ষিণ করে বাণ।
বীরাসনে বসি করে অভয় প্রদান।
বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্র ধরে।
ভরত শত্রুঘ্ন পাশে তালবৃন্ত করে॥
দশরথ পৃষ্ঠে নিহালে নয়নে। (?)
অগ্রে ব্যগ্র হনুমন্ত পবন-নন্দনে॥
সুগ্রীব অঙ্গদ চারি পাশে কপিগণ।
জাম্বুবান মন্ত্রী সখা রাজা বিভীষণ॥
সভায় বসিয়া সদা শাসয়ে ধরণী।
ধর্ম্ম সংস্থাপন কৈল প্রভু রঘুমণি॥
দয়াবান রাম নাম নিলে মুক্তি পায়।
অপার সাগর পার অনায়াসে যায়॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা।
পৃথ্বীচন্দ্রে রচে গীত অপূর্ব্ব রচনা॥ ১॥

রঘুনাথ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
ভাষায় রচায়ে সে ভূষণ্ডী রামায়ণ॥
লঙ্কেশ্বর রাবণ হইল মহারাজা।
তপস্যা কঠোর করি হইল মহাতেজা॥
বাহুবলে ত্রিভুবন হইল বিজয়।
দেবতা সকল দ্বারী আজ্ঞা ভৃত্য রয়॥
পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র হইল বহুগণ।
মহাসুখে রাজ্য করে লঙ্কায় রাবণ॥

একদিন মনে হইল কালে করি ডর।
মৃত্যু নাই হয় আমি হইয়ে অমর ॥
বিধাতা কিরূপে মোর লিখেছে মরণ।
তাহা নাই হয় যাহে করি আয়োজন ॥
মন্ত্রী তার ছিল শুক সারণ আখ্যায়।
জিজ্ঞাসে রাবণ তাহে নিকটে ডাকায় ॥
কহে মম মৃত্যুবিধি কিরূপে লিখিল।
মন্ত্রী মনে করে দায়ে এবার পড়িল ॥
কি জানি অপ্রিয় বাক্য শুনি ক্রোধ করে।
আমরা না কই এই কহে অন্য পরে ॥
এত মনে করি কয় শুনহ রাজন।
আমি না কহিতে পারি ইহার কারণ ॥
কর্ম্ম বিচক্ষণ দুই ভাই য়াছে বনে।
হিমালয় পার্শ্বে চিন্তা করে নারায়ণে ॥
জিজ্ঞাসিলে তাহারে জানিবে মহাশয়।
শুনি রথ আরোহণে জায় হিমালয় ॥
দূরে রথ রাখি মূর্ত্তি হইয়া ব্রাহ্মণ।
দুই জন পাশে স্তুতি করয়ে রাবণ ॥
সমাধিতে ছিলা মুনি না করে উত্তর।
বিনয় বচনে কাল গেল সে প্রহর ॥
রাবণ করিল মনে বিনয় বচনে।
কেন বা পাইব কার্য্য ভয় না দরসনে ॥
বিনা ভয়ে মৈত্রতা না হয় কদাচিত।
জ্বলন্ত পাবক ন্যায় হইল কুপিত।
নিজমূর্ত্তি ধরে করে করি প্রহরণ।
দশ মুণ্ড বিংশ ভূজ প্রলয় কারণ ॥
অট্ট অট্ট হাস বহু করয়ে গর্জ্জন।
মুনির সমাধি গেল চাহে ঘন ঘন ॥
কয় কি কারণে তব হইল আগমন।
রাবণ কহিল এক করি নিবেদন ॥

বিধাতা আমার মৃত্যু কিরূপে লিখিল।
তাহা নাই হয় কিসে জিজ্ঞাসিতে আইল ॥
কর্ম্ম বিচক্ষণ ফল শুন মহাশয়।
বিধাতা তোমার এই করিল নির্ণয় ॥
কোশলের মহারাজা তাহার তনয়া।
কৌশল্যা তাহার নাম বটে দেবকায়া ॥
অযোধ্যার পতি দশরথ নরবর।
রঘুকুলে মহারাজা বড় ধনুর্দ্ধর ॥
তাহার সহিত বিভা কৌশল্যার হবে।
তাহার তনয় দৈত্যকুল বিনাশিবে ॥
তুমি একা নও ধরণীর নিশাচর।
সকল নাশিব সেই রঘুকুলবর ॥
শুনিয়া রাবণ কয় শুন মহাশয়।
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম হইব নিশ্চয় ॥
কৌশল্যারে বধ কৈলে অন্যে না হইব।
অমর হইয়া রাজ্য সকলে ভুঞ্জিব ॥
পৃথিবীর নিশাচর সভে রক্ষা পাবো।
লইয়া সকল গণ আনন্দে রহিবো ॥
কোশল সে দেশ কোথা দেখাও ব্রাহ্মণ।
কর্ম্মবিচক্ষণ ফল শুনহ রাজন ॥
তপস্যায় আছি আমি যাইতে না পারিব।
আমা দোহা হইতে কার্য্য সাধন নহিব ॥
যোগবলে জানি সেই কহিল তোমারে।
দশরথে সম্বন্ধ হইয়াছে দৃঢ়তরে ॥
বিধির লিখন যাহা তাহাই হইবে।
অনাহত শ্রম রাজা কার্য্যে না আসিবে ॥
শুনি কোপে রাজা দোহে করিয়া বন্ধন।
রথে করি লইয়া যায় কৌশল ভুবন ॥
কৌশল ভুবনে দেখে চতুর্দ্দিকে শিখী।
প্রলয় সমান জলে নাহি দেশ দেখি ॥

কোন মতে অগ্নি পার হইতে নারিল।
প্রলয় সময় জেন গর্জ্জিয়া উঠিল ॥
শুনি শুক সারণ সে জানিল কারণ।
ত্বরা করি গেল ইন্দ্রজিতের ভুবন ॥
কহিল তোমার পিতা ডাকিল তোমারে।
মেঘ সঙ্গে লইয়া জাও আর পরিবারে ॥
শুনি মেঘনাদ সৈন্য করিয়া সাজন।
মেঘ লইয়া ত্বরা করি করিল গমন ॥
মেঘনাদে দেখি কয় মেঘে নিয়োজয়।
নির্ব্বাণ করিয়া শীঘ্র দেও অগ্নিচয় ॥
মেঘগণে আজ্ঞা দিল বর্ষিতে রাবণ।
প্রলয় কালের মত করয়ে বর্ষণ ॥
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি সসৈন্যে রাবণ।
বেড়িয়া ঘেরিল সেই রাজার ভুবন ॥
অনেক পড়িল সৈন্য ভূপতি কাতর।
রাবণে কহয়ে স্তুতি বাক্য বহুতর ॥
রাবণ কহয়ে তব কন্যা দেহ মোরে।
আনিয়া ভূপতি কন্যা দিল কৌশল্যারে ॥
কৌশল্যা লইয়া শীঘ্র জায় নৃপবর।
লঙ্কা জাইয়া সিংহাসনে বৈসে নিশাচর ॥
মন্ত্রীগণ ডাকি আনে অমাত্য সকলে।
কহে সভে কন্যা এক পাইল কৌশলে ॥
ইহার উদরে যেই সন্তান হইবে।
সংসারের নিশাচর সেই সে বধিবে ॥
ইহারে বধিলে রক্ষা পাবে নিশাচর।
আনন্দে থাকিব সভে হইয়া অমর।
দুষ্টগণ কয় বধ উচিত ইহার।
বিভীষণ কয় রাজা করহ বিচার ॥
আপনে পণ্ডিত জানি যশ ত্রিভুবনে।
নারীবধ অনুচিত নাই করি মনে ॥

বিশেষে কুমারী কন্যা পূজ্য সভাকার।
বধ করা নয় রাজা জে হয় বিচার ॥
কারাগারে বন্দী কর এই যুক্তি হয়।
দেবগণ যথা বন্দী তথাকারে রয় ॥
রাবণ কহেন রঘুকুল বলবান।
কি জানি বা লইয়া জায় ভাবিয়ে নিদান ॥
বিভীষণ কয় তব মৈত্র জলচর।
রাঘব যাঁহার নাম অতি কলেবর ॥
তাহে সমর্পণ কর রাখিবে যতনে।
কার সাধ্য জলে হইতে করয়ে হরণে ॥
স্বস্তি বলি রাঘবে বেড়া কৈল নৃপতি।
আইল রাঘব সেই আজ্ঞামাত্র তথি ॥
মঞ্জুসে করিয়া কন্যা কৈল সমর্পণ।
রাঘব কহয়ে রাজা করি নিবেদন ॥
আহার করিলে চরে রাখিব কন্যারে।
পুণরায় উদরে সে রাখিবো তাহারে ॥
ইতি মধ্যে কন্যা কেহু করয়ে হরণ।
মম দোষ নয় ইহা কৈল নিবেদন ॥
ইহা বোলি কন্যা লইয়া করিল গমন।
মঞ্জুসে থাকয়ে কন্যা উদরে পূরণ ॥
চরয়ে যখন কন্যা চর মধ্যে রাখে।
পুণরায় গ্রাসে কন্যা উদরেতে থাকে ॥
নিঃশঙ্কে রাবণ রাজা থাকে সিংহাসনে।
বন্দী করি রাখিলেক কর্ম্ম বিচক্ষণে ॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা।
ভূষণ্ডী কাকের মত করিব রচনা ॥২॥

ত্রিপদী।

রাবণ হরণ কৈল দশরথ বার্ত্তা পাইল
চিন্তাযুক্ত হইল রাজনে।

মনে করে নৃপবর বধ কৈল নিশাচর
আর কন্যা না পাই জতনে ॥
উপায় করয়ে চিন্তা কেমনে পাইবে কান্তা
সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত মন।
কৌশলের অধিপতি শুদ্ধসত্ত্ব মহামতি
বেদমন্ত্রে করিল বরণ ॥
সুমন্ত্র মন্ত্রীরে আনি দশরথ কয় বাণি
শুন কই উদ্যোগ কারণ।
রাবণ হইল দুষ্ট কোন মতে করি নষ্ট
সমরের কর আয়োজন ॥
সুমন্ত্র কহেন রাজা নিশাচর মহাতেজা
শিব সন্নিধানে পাইয়া বর।
তাহারে বা কেবা পারে অপার সাগর পারে
কেবা তার প্রবেশে নগর ॥
মোরে আজ্ঞা এই হয় জাই আমি হিমালয়
আরাধনা করি পশুপতি।
যদি হর বর দিব কামনা পূরণ হব
আসি তার করিব যুকতি ॥
শুনি দশরথ কয় উচিত এ যুক্তি হয়
শীঘ্র তুমি করহ গমন।
সুমন্ত্র ত্বরায় যায় হিমালয় গিরি পায়
চিন্তা করে দেব ত্রিলোচন ॥
কঠোর তপস্যা কৈল মহাদেব তুষ্ট হইল
বর দিতে আইলা মহেশ্বর।
করজোড়ে মন্ত্রী কয় দেব দেব দয়াময়
এই আমি চাহি দেহ বর ॥
লঙ্কার রাক্ষস জত পরাভব পায় তত
যদি মম সঙ্গে করে রণ।
তথাস্তু বলিয়া হর সুমন্ত্রেরে দিলা বর
প্রণমিয়া আইলা ভুবন ॥

দশরথ তুষ্ট হইলা প্রেম আলিঙ্গন দিলা
হেন বেলে নারদ গমন।
রঘুনাথ পদে মতি চায় ভূমি নিশাপতি
চিন্তি সদা শ্রীরামচরণ ॥৩॥

পয়ার।

নারদে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সিংহাসনে বসাইল ॥
রাজা কয় মহামুনি তব আগমন।
পবিত্র হইল তনু পবিত্র ভুবন ॥
কি কারণ আগমন কহ কৃপা করি।
মুনি কন কই রাজা তোমা বরাবরি ॥
কৌশলের রাজা সুতা কৌশল্যা সুন্দরী।
তোমার সহিত বিভা দিব মনে করি ॥
বরণ করিল রাজা দেবের বিধানে।
হরিয়া লইল তারে লঙ্কার রাবণে ॥
তোমারে তাহারে রাজা উদ্ধারিতে হয়।
নহিলে কলঙ্ক রঘুকুলে মাত্র রয় ॥
রাজা কয় তাহে আমি হইয়া লজ্জিত।
উদ্যোগে আছিয়ে কিন্তু না হয় ত্বরিত ॥
সাগরের পার লঙ্কা শঙ্কাযুত স্থান।
কাহারে পাঠাই তথা কেবা বলবান ॥
মুনি কন পাঠাইলে নারিবে তাহারে।
মঞ্জুসে করিয়া কন্যা রাখাছে সাগরে ॥
রাঘবের উদরে থাকয়ে দিবানিশি।
চরণের কালে চরে রাখয়ে মঞ্জুসি ॥
সেই কালে চুরি করি যদি কেহ য়ানে।
তবে সে পাইবা কন্যা কহিল বিধানে ॥
রাজা কয় হেন সাধ্য আছয়ে কাহার।
কিরূপে জাইবে সেই সাগরের পার ॥

মুনি কন আমি এই করিয়াছি ধার্য্য।
তোমার প্রধান সখা গড়ুরের কার্য্য॥
স্মরণ করহ ভূপ আসিব এখন।
করিব তোমার কার্য্য নিতান্ত বচন॥
শুনি দশরথ সখা গড়ুরে স্মরিল।
তৎক্ষণাৎ সেইখানে গড়ুর আইল॥
কহে সখা কি করিব কহ বিবরিঞা।
দশরথ কন কন্যা রাবণে হরিয়া॥
লইয়া গেল রাখিয়াছে মঞ্জুসে তাহায়।
রাঘব উদরে থাকে কদাচ বাক্রায়॥ (?)
চরণে রাখয়ে চরে মঞ্জুস সহিত।
পুণরায় গ্রাস করে উদরে পূরিত॥
চরে রাখে সেই কালে কন্যারে লইয়া।
আনি দাও সখা শীঘ্র ত্বরিত হইয়া॥
শুনিয়া গড়ুর জান সাগরের পার।
দেখে কন্যা মঞ্জুসে আছয়ে জলধার॥
চঞ্চুতে লইয়া শীঘ্র করিল গমন।
উপনীত হইল আসি অযোধ্যা ভূবন॥
দেখি দশরথ কন্যা অতি তুষ্ট হইল।
সুমন্ত্র মন্ত্রীকে আনি বয়ান কহিল॥
কন্যা লইয়া যাও তুমি কৌশল নগর।
কন্যা দিয়া কহিবে ভূপতি বরাবর॥
বিধিমত বিভা দিলে আনিবো কন্যারে।
সসৈন্যে থাকিবে তুমি রাজার দুয়ারে॥
দুষ্টগণ আইসে নষ্ট করিবে সমরে।
সাবধানে সদত থাকিবে তার পুরে॥
কন্যা লইয়া সুমন্ত্র চলিলা ত্বরা করি।
উপনীত হইল কৌশল বরাবরি॥
দেখি রাজা তুষ্ট হইয়া কন্যা কোলে করে।
বিবাহের আয়োজন নগরে মন্দিরে॥

রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা।
ভূষণ্ডি কাকের মত করিব রচনা॥৪।

পয়ার।

রাঘব আসিয়া দেখে কন্যা নাই চরে।
কেবা চুরি করিলেক ভাবয়ে অন্তরে॥
মৈত্রের জে কার্য্য আমা হইতে না হইল।
অনাহূত রাখি কন্যা অবশ পাইল॥
রাবণ নিকটে জাঞা কহে স্তুতি বাণী।
চরে কন্যা কেবা চুরি কৈল নাহি জানি॥
পূর্ব্বে আমি নিকটে করিল নিবেদন।
চরে রাখি আহারার্থে করিব ভ্রমণ॥
ইথে কেহু লইয়া জায় কহিব আসিয়া।
যে হয় উচিত রাজা কর বিবচিয়া॥
রাঘবের মুখে শুনি চিন্তয়ে রাবণ।
এমত দুর্গ মধ্যে কন্যা কে কৈল হরণ॥
মনে করে কর্ম্মবিচক্ষণে বন্দী কৈল।
কেবা লইয়া গেল কন্যা জিজ্ঞাসিতে হইল॥
এত মনে করি যথা কর্ম্মবিচক্ষণ।
জাইয়া জিজ্ঞাসে কন্যা কে কৈল হরণ॥
কার উপদেশে কন্যা কেবা লইয়া গেল।
কৃপা করি এই কথা কহিবারে হইল॥
নিজ পীড়া মনে নাই করয়ে সুজন।
ঘর্ষণে অধিক গন্ধ করয়ে চন্দন॥
কর্ম্মবিচক্ষণ কয় শুন মহাশয়।
নারদের উপদেশে জানিয়া বিষয়॥
দশরথ গড়ুরেরে দিল পাঠাইয়া।
কন্যা লইয়া গেল সেই চঞ্চুতে করিয়া॥
দশরথে দিল সে কৌশল পাঠাইল।
যোগবলে জানি সেই তোমারে কহিল॥

শুনি কোপে রাবণ ডাকয়ে পুত্রগণে।
ইন্দ্রজিত আদি আসি করয়ে স্তবনে॥
জে আজ্ঞা সে মহারাজ করিয়ে এখন।
শুনিয়া রাবণ কয় শুন পুত্রগণ॥
সকলের শত্রু জাবে এই করি মনে।
আনিলাম কৌশল্যারে করিত ভক্ষণে॥
দুষ্ট বিভীষণ বাক্যে সাগরে রাখিল।
গড়ুর আসিয়া চুরি করি লইয়া গেল॥
কৌশলে আছয়ে কন্যা আনহ বান্ধিয়া।
কেহ যদি জুঝে তারে আসিবে বধিয়া॥
আমি জাই নারদেরে করিয়া বন্ধন।
আনিয়া রাখিবো যথা বন্দী দেবগণ॥
আজ্ঞামাত্র ইন্দ্রজিৎ সৈন্যগণ লইয়া।
চলিল কৌশল অতি ক্রোধযুক্ত হইয়া॥
ঘেরিল নগর সভে ভয়ে কম্পবান।
সুমন্ত্র লইয়া সৈন্য হইল আগুয়ান॥
দুই দলে মহাঘোরতর যুদ্ধ হইল।
শিবের আছয়ে বর রাক্ষস নারিল॥
যে ক বাণ সুমন্ত্র সে করিল সন্ধান।
সকলে লইয়া গেল জার জেই স্থান॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ইন্দ্রজিৎ পৈল লঙ্কা।
দেখিয়া রাক্ষসগণ সভে পাইল শঙ্কা।
খর ও দূষণ যুদ্ধ অনেক করিল।
সুমন্ত্রের যুদ্ধে তার বহু সৈন্য পৈল॥
চতুর্দ্দশ সহস্র লইয়া পলাইল।
দণ্ডকের বন জাইয়া বসতি করিল॥
রাক্ষস সকল যুদ্ধে হইল পরাভব।
দশরথে সুমন্ত্র কহেন এই সব॥
দশরথ কন শীঘ্র কর আয়োজন।
বিবাহ করিয়া আনি অযোধ্যাভুবন॥

কৌশলের রাজা অতি হৃষ্ট হইল মনে।
কৌশল্যার বিভা দিল দশরথ সনে॥
বিবাহ করিয়া কন্যা আনে অযোধ্যায়।
সুমন্ত্র রহিল দ্বারী রাজার আজ্ঞায়॥
রঘুপতি পদে মন করি নিয়োজন।
পয়ারে রচিত সে ভূষণ্ডী রামায়ণ॥৫॥
রাবণ চলিল রথে নারদ উদ্দেশে।
পথে যেই মুনি দেখে তাহারে জিজ্ঞাসে॥
নারদ কোথায় আছে কহ মুনিগণ।
মুনি কয় ব্রহ্মপুরে আছয়ে রাজন॥
উপনীত হইল রাবণ ব্রহ্মপুরে।
নিশা হইল রথপরি থাকিল দুয়ারে॥
প্রভাতে নারদমুনি রামগুণ গাইয়া।
বাহির হইলা পুরী হরষিত হইয়া॥
দেখিয়া রাবণ ধরি আকর্ষণ কৈল।
বাহুযুদ্ধ করি মুনি রাবণে নারিল॥
দুই ভুজে বান্ধি লইয়া রথের উপরে।
আইল রাবণ রাজা লঙ্কার ভিতরে॥
সিংহাসনে বসি ডাকি সব পরিবার।
কহয়ে এখন এবে কি করি ইহার॥
কেহ কয় বন্দী রাখ কেহ কয় নয়।
কেহ কয় সাগরে ফেলাও মহাশয়॥
শুনি বাণি রাণী মন্দোদরী আসি কয়।
নারদ করিতে বধ উচিত না হয়॥
দেবঋষি তপস্বী পরম জ্ঞানবান।
দেবগণে সদা যার করয়ে বাখান॥
মুক্তি করি দেও রাজা যান নিজস্থান।
তবে সে জানিবে নাথ নিশ্চয় কল্যাণ॥
মন্দোদরী বাক্যে রাজা মুক্তি করি দিল।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি ব্রহ্মপুরে গেল॥

সর্ব্বদা আসিয়া লঙ্কা করে আশীর্ব্বাদ।
ভয়ে সদা ভীত কিবা করয়ে প্রমাদ॥
একদিন রাবণ নারদে জিজ্ঞাসয়।
বাহুবলে ত্রিভুবন হইলাম জয়॥
আর নাই বীর দেখি যে তিন ভুবনে।
বাহুকুণ্ডূয়ণ আর করি কার সনে॥
নারদ কহেন সত্যলোকে বীর আছে।
বনপারে মহারাজা গেলে তার কাছে॥
শুনিয়া রাবণ রাজা পুষ্পক বিমানে।
সহ সৈন্যে সত্যলোক করিল গমনে॥
নগর বাহির রথ রাখি এক স্থানে।
জলাশয় দেখে তথা অতি সুনির্ম্মানে॥
স্বর্ণময় জল রাঙ্গা স্বর্ণের সোপান।
সিদ্ধ মুগ্ধ জল পানে নাহিক বাখান॥
সুন্দরী সকল জল লয় কুম্ভে ভরি।
স্বর্ণের কলস কক্ষে শত শত ধরি॥
রাবণে দেখিয়া নারীগণ হাস্য করে।
বিকৃতি আকার আর না দেখি সংসারে।
কেহু কয় বালকের খেলাবার লাগি।
আমি লব কেহু কয় আমি তাহে ভাগী॥
রাবণে বান্ধিয়া গলে লইয়া জায় বলে।
জেমত বান্ধিয়া জায় লইয়া ছাগলে॥
লজ্জায় লজ্জিত রাজা নাই পারে বলে।
বন্ধন ঘুচাইয়া পলাইয়া জায় ছলে॥
রথে চড়ি রাবণ আইল নিজালয়।
অপমানে সতত দুঃখিত মনে রয়॥
নারদে ডাকিয়া পুণঃ করয়ে জিজ্ঞাসা।
কার বলে এত বলী কহ সত্য ভাষা॥
নারদ কহেন বিষ্ণুবলে বলী হয়।
বিষ্ণু সে সভার শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয়॥

রাবণ সতত ভাবে বিষ্ণু বড় বীর।
তারে পরাভাব কিসে করে নহে স্থির॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া ভাবনা।
পয়ার প্রবন্ধে রাম গুণের বর্ণনা॥৬॥
রাবণ করয়ে মনে বিষ্ণু বলবান।
কিরূপে বিজয় হঞা লই তার স্থান॥
একা পারি না পারি বা ভাবি মনে মনে।
বিষ্ণু শত্রু আছে বলি পাতাল ভুবনে॥
একতা হইয়া দুই জনে করি রণ।
পরাভব করি লই বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
এত মনে করি জায় পাতাল ভুবন।
বলিদ্বারে উপনীত হইল রাবণ॥
দেখে দ্বারে গদাপাণি আছে একজন।
রাবণে না কয় কিছু প্রবেশে ভুবন॥
শয়নে আছিল বলি দেখা না পাইল।
সিংহাসন ছিল তথি রাবণ বসিল॥
আলাপে আনন্দে দোহে বসিয়া সভায়।
আগমন কারণ সে জিজ্ঞাসিল তায়॥
রাবণ কহেন বিষ্ণু তব শত্রু হয়।
আমার সে শত্রু সেই জানিবে নিশ্চয়॥
মনে করি দুই জনে একত্র হইয়া।
যুদ্ধ করি বিষ্ণু পরাভব করি জাইয়া॥
মনোযোগ কৈলে কার্য্য অবশ্য হইব।
সংসারের মধ্যে দোঁহে জয়বান হব॥
আমার আছয়ে লঙ্কা শঙ্কা নাই তায়।
বৈকুণ্ঠের অধিপতি করিব তোমায়॥
বলি কন বটে তুমি অবশ্য পারিবা।
কিন্তু কিছু কই তায় বিষয় জানিবা॥
গদাপাণি দ্বারে কেহু দেখাছে নয়ানে।
তার ভয়ে বাহির হইতে নারি স্থানে॥

আর এক কহি শুন রাক্ষসের পতি।
ঈশানে আছয়ে এক পর্ব্বত আকৃতি॥
দেখ তারে তোল দেখি করি আকর্ষণ।
তবে সে জানিব বলবান যোগ্যরণ॥
শুনিয়া ঈশান জায় ভুপতি রাবণ।
দেখয়ে পর্ব্বত অতি প্রকাণ্ড পুরণ॥
বাহু পসারিয়া গিরি তুলিবারে যায়।
নড়াইতে শক্তি তায় নহিল তথায়॥
তথা হইতে আসি বলিরাজে নিবেদয়।
নড়াইতে শক্তি মোর নহিল নিশ্চয়॥
বলি কয় নড়াইতে নারিলে রাবণ।
ছিল মধুকৈটভের কর্ণের ভূষণ॥
তাহারে বধিল বিষ্ণু এত বল ধরে।
সংসারের মধ্যে তারে সমরে কে পারে।
আমি খর্ব্ব দেখি দান দিতে কৈল মন।
এক পদে লইলেন এ তিন ভুবন॥
এক পদে লইলেন আকাশ সকল।
এক পদ শিরে দিয়া রাখিলেন তল॥
গদাপাণি হইয়া স্থিতি আমার দুয়ারে।
বৈরীভাব করি কভু নারিবে তাহারে॥
ভক্তিবশ ভগবান শুনহ রাজন।
সর্ব্বদা করহ চিন্তা দেব নারায়ণ॥
অমর হইতে চাও সেই কোন দায়।
রাজ্যের অধিক চাও তুচ্ছ দেওয়া তায়॥
বৈকুণ্ঠভুবনবাস ভাবিলে সে হয়।
মহাসুখে সতত থাকিবে মহাশয়॥
এই যুক্তি কই তব জেবা লয় মনে।
বিদায় করিল তারে সন্তোষ বচনে॥
রঘুনাথ পাদপদ্ম করিয়া ভাবনা।
রামায়ণ রচি কিছু অপূর্ব্ব রচনা॥৩॥

রাবণ বিদায় হইয়া আইল লঙ্কায়।
সিংহাসনে বসি মন্ত্রীগণেরে ডাকায়॥
কয় ত্রিভুবন আমি হইলাম জয়।
লইয়ে বৈকুণ্ঠ এবে মনে এই হয়॥
ইহার যে যুক্তি হয় কহ মন্ত্রীগণ।
কিরূপে এ হয় কার্য্য কি করি সাধন॥
মন্ত্রীগণ কয় বিষ্ণুবল দেবগণ।
দশদিকপালে আন করিয়া বন্ধন॥
ক্রমে ক্রমে দেবগণ আন হইয়া জয়।
দুর্ব্বল হইব বিষ্ণু কহিল নিশ্চয়॥
যুদ্ধ যত হয় তাহা করহ রাবণ।
পরাভব পাবো বিষ্ণু শুনহ রাজন॥
মন্ত্রীবাক্য শুনি তুষ্ট হইলা রাবণ।
ধরিয়া আনয়ে দশদিকপালগণ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আসি স্তুতি কয়।
কি কার্য্য করিব আজ্ঞা হয় মহাশয়॥
রাবণ কহয়ে লব বৈকুণ্ঠ ভুবন।
সহায় হইবে সভে এই নিবেদন॥
দেবগণ কয় রাজা সহায় হইব।
কিন্তু বলবান বিষ্ণু যুদ্ধে না পারিব॥
মনে করে বিষ্ণু বড় হয় বলবান।
কিরূপে করিব যুদ্ধ করে অনুমান॥
দেবগণ নারিল অসুর না পারিল।
বিষ্ণু পরাভব কিসে হয় না জানিল॥
ত্রিকালজ্ঞ হয় মুনি কর্ম্ম বিচক্ষণ।
জিজ্ঞাসা করিতে তথা চলিল রাবণ॥
জিজ্ঞাসে রাবণ কর্ম্ম বিচক্ষণ।
বিষ্ণু বলহীন কিসে কহিবে কারণ॥
কর্ম্ম বিচক্ষণ কয় বন্দী তব ঘরে।
জ্ঞানবুদ্ধি যোগবল গেল সে অন্তরে॥

রাবণ কহেন এই দেও উপদেশ।
মুক্তি করি দিব জাবে আপনার দেশ॥
কর্ম্মবিচক্ষণ কয় শুন মহাশয়।
যজ্ঞদান জপে বলবান বিষ্ণু হয়॥
পৃথিবীর কর্ম্মকাণ্ড করহ হরণ।
অবশ্য ত্যজিব বিষ্ণু বৈকুণ্ঠভুবন॥
সন্তোষে রাবণ দোঁহে বিদায় করিল।
কর্ম্মবিচক্ষণ হিমালয় পাশে গেল॥
দূতগণে ডাকিয়া রাবণ সভে কয়।
ভ্রমণ করহ তুমি সকল আলয়॥
যজ্ঞদান যথা হয় করহ রাবণ।
বনে বনে মুনিগণে করহ ভক্ষণ॥
এত বোলি দূতগণে নিযুক্ত করিল।
আপনে অনেক স্থানে ভ্রমিয়া ফিরিল॥
সমীরণ নামে মুনি শিলা তার নারী।
কন্যা আশে তপস্যায় থাকে বনচারী॥
অবিরত মহামায়া করয়ে চিন্তন।
কন্যা এক দাও মাতঃ এই নিবেদন॥
উপনীত রাবণ হইল তার পাশে।
আইলাম তব সন্নিকট যুদ্ধ আশে॥
সমীরণ কন আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
যুদ্ধ যোদ্ধা নাহি রক্ষা করহ রাবণ॥
কহেন রাবণ দিগ্‌বিজয়ী হইল।
তোমারে হইব জয়ী মনেতে আছিল॥
না পারিলে যদি পরাভব পত্রী লিখ।
লিখিয়া দিলেন মুনি স্বাক্ষরে অধিক॥
রাবণ কহেন যদি পরাভব হইলা।
রাজকর দিয়া বনে থাকে লইয়া শিলা॥
মুনি কয় করযোগ্য কিয়াছে আমার॥
শরীর কেবল মাত্র যে ইচ্ছা তোমার॥

রাবণ কহেন শরীরের রক্ত লব।
ইহা বলি বাণে ছেদি রক্ত নিল সব॥
কলসে করিয়া লইয়া জায় নিজপুরী।
রাখে উচ্চে কয় বিষ রয় মন্দোদরী॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা।
রামায়ণ গ্রন্থ এই অপূর্ব্ব রচনা॥ ৮॥
অনেক লইয়া নারী কানন ভ্রমণে।
চলিল রাবণ বনে হরষিত মনে॥
করয়ে খনেক ক্রীড়া নারীগণ লইয়া।
শতেক বৎসর জায় কাননে বহিয়া॥
মন্দোদরী একা গৃহে থাকে ধৈর্য্য ধরি।
আইলা নারদ মুনি তার বরাবরি॥
কহেন রাবণ জত করয়ে বেহার।
শুনি রাণী মন্দোদরী বিরহ অপার॥
মনে করে বিরহে না রাখিব জীবন।
রাখিয়াছে রাজা বিষ করিব ভক্ষণ॥
এত মনে করি কলসের রক্ত খাইল।
সেই দিন হইতে রাণী গর্ভবতী হইল॥
মনে করে নাথ গৃহে নাইক আমার।
গর্ভবতী দেখে হবে কুলের খাঁকার॥
যদি রাজা দেখিব বধিব মোর প্রাণ।
কিরূপে এ গর্ভ যায় করে অনুমান॥
দশ মাস গেল কন্যা প্রসব হইল।
তড়িতের লতা জেন দেখিতে পাইল॥
স্বর্ণের কলস করি সাগরে ফেলিল।
বিষম রোদানী তাহা গরাস করিল॥
রোদানী লইয়া আসি মিথিলা নগরে।
রাখিল কলসী তথি মৃত্তিকা ভিতরে॥
কৃষক চসয়ে চাস সেই ভূমিতলে।
উঠিল কলস সীতা লাগি সেই স্থলে॥

কৃষক জনক ভূপে দিল সে কলসী।
কলস ভিতর কন্যা পাইল রূপসী॥
জনক করিল মনে দেবতার কায়া।
অবনীতে অবতার কৈল মহামায়া॥
রাণীকে দিলেন রাজা কন্যা রূপবতী।
পালন করয়ে রাজা জানিয়া সন্ততি॥
দিনে দিনে বর্দ্ধমানা শুক্লপক্ষে শশী।
ত্রৈলোক্যে তুলনা নাই এমত রূপসী॥
শুনি মুনিগণ সব আইলা দরশনে।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া রাজা করিল পূজনে॥
সভে কন কন্যা রাজা পাইলে কোথা হইতে।
যেরূপ পাইল রাজা কন বিস্তারিতে॥
শুনিয়া সকল মুনি চান দরসন।
অনাইলা কন্যা সভে কৈলা নিরীক্ষণ॥
দেখি সভে কন শুন জনক রাজন।
এই কন্যা যোগমায়া নিতান্ত বচন॥
বিষ্ণুর বল্লভা বিনা অন্যের না হয়।
নাম সভে রাখি এই শুন মহাশয়॥
সীতা হইতে হইলা সেই নাম এক সীতা।
জানকী বোলিব নাম জনকের সূতা॥
মৈথিলী কহিবো মিথিলায় উৎপত্তি।
বসুতে উৎপত্তি সেই কই বসুমতী॥
নাম রাখি মুনিগণ হইলা বিদায়!
শিবের করিতে তপ নরপতি জায়॥
বহুদিন তপ কৈল, জনক রাজন।
বর দিতে আইলা তবে দেব ত্রিলোচন॥
মনমত বর নেয় জনক নৃপতি।
তুষ্ট হইয়া ধনু এক দিলা পশুপতি॥
ধনুকে রাখিবে গৃহে হইবে বিজয়।
কারু সাধ্য নাই হবে ধরিয়া তুলয়॥

অবতার করি হরি ধনুক ভাঙ্গিব।
অন্যের এ সাধ্য রাজা কদাচ নহিব॥
বর পাইয়া জনক আইল নিজালয়।
করিলা প্রতিজ্ঞা এই সকলে শুনয়॥
জে ভাঙ্গিব করি খান খান।
তাহারে তনয়া সীতা করিব প্রদান॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা।
কাব্য রামায়ণ এই করিল রচনা॥ ৯॥

ত্রিপদী।

জনক প্রতিজ্ঞাবাণী শুনি জত নৃপমণি
ধনু ভাঙ্গিবার আশে যায়।
ধনুর নিকটে যায় তুলিতে না পারে তায়
লজ্জাযুক্ত হইয়া পালায়॥
যত যত বীর আইসে যায় ধনুকের পাশে
কারু সাধ্য নহে তুলিবারে।
সীতা পাবো মনে আশ নাই জায় নিজ বাস
জায় সভে তপ করিবারে॥
রাবণ শুনিয়া পণ চিন্তাযুক্ত হইয়া মন
নাম মোর আছে ত্রিভূবনে।
যদি ভাঙ্গিবারে নারি লজ্জা হব দিগ্‌চারি
অপযশ কবে সর্ব্বজনে॥
নিশায় জাইয়া দেখি পারি কিনা পারি লখি
যদি ধনু পারি তুলিবারে।
প্রভাতে প্রকাশ হব সভামধ্যে জাইয়া কব
ধনু ভাঙ্গি আনিব সীতারে॥
রাবণ নিশায় জায় জনক ভূবন পায়
ধনুঘর করে অন্যাসনে।
বাণ রাজা মনে করি সেও আসে সেই পুরী
দুই জন একত্র ভূবনে।

বাণে কয় নিশাচর বট তুমি বীরবর
ভাঙ্গ ধনু দেখি যে পৌরুষ।
বাণ কক্ষ মম গুরু শিব বাঞ্ছা-কল্পতরু
প্রণমিয়া হইব সন্তোষ॥
দেখিয়া পবিত্র তনু আমার ইষ্টের ধনু
আমার কি সাধ্য ভাঙ্গিবারে।
তুমি কি করিয়া মনে আসিয়াছো এ ভুবনে
ধর ধনু পারো তুলিবারে॥
রাবণ কহেন আমি সহিত জগত স্বামী
তুলিয়াছি কৈলাস শিখরে।
এ ধনু কি যোগ্য মম নহে এক বাহু সম
আইলাম মাত্র দেখিবারে॥
দুই জনে বোলা বোলি জায় নিজ পুরী চলি
একা রেতে পরাভব পাইল।
আর জত রাজগণে কেহ নাই করে মনে
সভে ভয়ে কম্পমান হইল॥
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ রামগুণ মহানন্দ
শ্রবণে পবিত্র কলেবর।
রঘুপতি পদে মতি চাহে ধরা খপাপতি (?)
মন যেন থাকে নিরন্তর॥ ১০॥

পয়ার।

ইক্ষাকু বংশে দশরথ মহারাজা।
পুত্রের সমান সে পালন করে প্রজা॥
অযোধ্যানগরে বাস রাজচুড়ামণি।
বাহুবলে সসাগরা শাসিল ধরণী॥
কৌশল্যা প্রথম জায়া কেকই দ্বিতীয়া।
সুমিত্রা সুন্দরী অতি বণিতা তৃতীয়া॥
আর শত শত রাণী ভোগ্যা যোগ্যা রয়।
সন্তান কারণ রাজা যজ্ঞ আরম্ভয়॥

কৌশল্যার গর্ভে জন্ম হইলেন জ্যেষ্ঠ।
বশিষ্ঠ রাখিল রাম নাম সভে শ্রেষ্ঠ॥
কেকইর গর্ভে হইলা ভরত সুন্দর।
সুমিত্রা লক্ষ্মণ প্রসূ শত্রুঘন বর॥
চারি পুত্র হইল রাজা আনন্দে অপার।
সুখে রাজ্য করে লইয়া সর্ব্ব পরিবার॥
বিশ্বামিত্র সহায়ে চলিলা রঘুবর।
মিথিলা নগর গেলা জনকের ঘর॥
হরধনু ভাঙ্গিরাম পূর্ণ কৈলা পণ।
দশরথ আইলা সহ পরিবারগণ॥
রামে সীতা বিভা দিলা জনক ভূপতি।
ঊর্ম্মিলা আপন কন্যা লক্ষ্মণ সঙ্গতি॥
ভ্রাতৃকন্যা মাণ্ডবী ও কীর্ত্তি দুই নারী।
ভরত সে শত্রুঘনে সমর্পন করি॥
চারিপুত্র পুত্রবধু লইয়া দশরথ।
অযোধ্যা গমনে ভৃগু আগুলিল পথ॥
দর্প দূর করি হরি আইলা অযোধ্যায়।
দ্বাদশ বৎসর বাস করিল তথায়॥
পিতৃ আজ্ঞা অনুজায়ে কানন গমন।
সীতা সহ রাম আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
দণ্ডকে অনেক নিশাচরে বধ করি।
পঞ্চবটী বনে বাস করিলেন হরি॥
সূর্পণখা কর্ণ নাসা করিয়া ছেদন।
সমরে বধিল খর দূষণের গণ॥
রাবণ হরিয়া সীতা লঙ্কায় রাখিল।
মাতৃবৎ সদা সেবা তথায় করিল॥
বায়ুপুত্র আসি রাম সেবক হইল।
সুগ্রীবের সঙ্গে তথা মৈত্রতা করিল॥
বালি বধ করি রাজা করিল তাহারে।
হনুমান এক লম্ফে তরিলা সাগরে॥

সীতার সংবাদ আনি দিল রঘুবরে ॥
সমরে রাক্ষসগণে করিয়া নিধন।
শেষে যুদ্ধে রাবণের করিল নিধন ॥
সীতার উদ্ধার করি লইয়া পরিবার।
পুষ্পক বিমানে আইলা সাগরের পার ॥
অনুব্রজি ভরত আইলা সহগণ।
পথে রাম সীতা সহ হইল দরশন ॥
অযোধ্যা নগরে রাম হইলেন রাজা।
দরশন আশে সব আইলেন প্রজা ॥
শাসন করিয়া ধরা রাম রাজ্য করে।
লক্ষ লক্ষ শিবলিঙ্গ স্থাপিল শিখরে ॥
মুনিগণ দরশনে আইলা অযোধ্যায়।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাম সকলে বসায় ॥
মঙ্গল জিজ্ঞাসে রাম মুনিগণে কয়।
তোমার প্রসাদে মুনিগণের নির্ভয় ॥
রাক্ষসে ভক্ষণ জত কৈল মুনিগণ।
গণনা না হয় কত করি নিবেদন ॥
দুষ্টের দমন হেতু তব অবতার।
কৃতার্থ করিলে প্রভু দুখ নাই আর ॥
সীতারে সম্ভাষা মুনিগণ সব কৈল।
তোমার প্রসাদে মাতা ধরা সুস্থ হইল ॥
বক্রী জে আছয়ে মাতা করত স্মরণ।
তুমি সে জগতকর্ত্রী পালন কারণ ॥
কৃপা করি কর মাতা থাকুক সংসার।
জানিবে জগতমাতা আপনি কুমার ॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া ভাবনা।
রামায়ণ কাব্যগীত অপূর্ব্ব রচনা ॥ ১১ ॥

পয়ার।

মুনিগণ মুখে রাম শুনিয়া কথনে।
কহেন কি আর দুষ্ট আছয়ে ভুবনে ॥

মুনিগণ কন শুন প্রভু নারায়ণ।
রাবণ হইতে শ্রেষ্ঠ আছে দুষ্টজন ॥
আছয়ে যে রাবণ আছ লঙ্কার মাঝারে।
অমর অসুরগণ আছে যার দ্বারে ॥
শক্তি ভক্তি মুক্তি হেতু বিনা নাই তার।
তাহারে সমরে বধে সাধ্য নহে কার ॥
জানকী জানেন তার সব বিবরণ।
আমরা সে দাস মাত্র করালো স্মরণ ॥
শুনি মুনিবাক্য রাম সীতারে জিজ্ঞাসে।
কহ সত্য কেবা জান ইহার বিশেষে ॥
সীতা মনে করে এক লঙ্কার কারণে।
কত দুখ দিল আর কি করে এখনে ॥
পতিব্রতা পতি আজ্ঞা করিতে পালন।
করজোড় করি রামে করে নিবেদন ॥
ত্রিকালজ্ঞ মুনিগণ জানে বহুতর।
আমি নারী কি জানিব নহি সতন্তর ॥
পিতার আলয়ে স্থিতে আইলা এক মুনি।
বৈখট তাহার নাম অতি বড় জ্ঞানী ॥
চতুর্ম্মাস্যা বাস হেতু কহিলা পিতারে।
রাজা ভাগ্য মানি তারে রাখিলা মন্দিরে ॥
সেবা হেতু মোরে তথা কৈল নিয়োজন।
চারি মাস সেবা করিলাম অনুক্ষণ ॥
বরষা প্রভাতে মুনি হইলা বিদায়।
প্রসন্ন হইয়া মোরে হইলা বরদায় ॥
কহিলা হইবে রঘুনাথের বনিতা।
পালিবে সংসার হইয়া সকলের মাতা ॥
রাম সহ বন যাবে দ্বাদশ বৎসর।
হরিয়া লইব তথি লঙ্কার ঈশ্বর ॥
রাবণে বধিয়া রাম উদ্ধার করিবা।
আসিয়া অযোধ্যাপুরী আনন্দে রহিবা ॥

আছয়ে রাবণ এক আহুলঙ্কা মাঝে।
তোমা হইতে বধ সেই হইবেক পাছে॥
ইহা বোলি মুনি গেল আপন কাননে।
ইহা বিনা নাই জানি কৈল নিবেদনে॥
রাম কন কেমন রাবণ সে জানিবো।
অবশ্য লইয়া সৈন্য আহুলঙ্কা জাবো॥
আনিয়া পুষ্পকরথ করি আরোহণ।
আহুলঙ্কা রঘুনাথ করিলা গমন॥
সীতা রাম লক্ষ্মণ চলিলা বিভীষণ।
হনুমান সুগ্রীব অঙ্গদ কপিগণ॥
জাম্বুবান অযোধ্যায় রাজসেনাগণ।
মুণিগণ রথে চড়ি করিলা গমন॥
আহুলঙ্কাদ্বারে আসি হইলা উপনীত।
দ্বারে আছে ঘণ্টা এক অতি বিপরীত॥
ঘণ্টাধ্বনি যেই জন আসিয়া করিবে।
তাহার সহিত রাজা সংগ্রামে যুঝিবে॥
রাবণ সহস্রবাহু অতীব আকৃতি।
গমন করিলে পদভরে কাঁপে ক্ষিতি॥
সমুদ্র সদৃশ চতুর্দ্দিকে সেনাগণ।
সমর করিতে নাই পারে কোনুজন॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া ভাবনা।
রচিল অপূর্ব্ব রামায়ণ শুদ্ধমনা॥ ১২॥
হনুমানে আজ্ঞা কৈলা প্রভু রঘুমণি।
তুমি জাইয়া কর রাজদ্বারে ঘণ্টাধ্বনি॥
আজ্ঞামাত্র ঘণ্টাধ্বনি কৈল হনুমান।
শুনিয়া রাবন মনে করে অনুমান॥
পৃথিবীতে এমত আছয়ে মহাবীর।
আমার সমরে কেহু হইবেক স্থির॥
দূতে কয় দেখ জাঞা কোন বীর আইল।
দেবতা দানব বুঝি বিস্মরিত হইল॥

শত শত দূত জায় সৈন্য দেখিবারে।
দেখি বীরগণ সব আছয়ে দুয়ারে॥
দেখি জাঞা কয় রাবণের বরাবর।
আসিয়াছে ভল্লুক বানর আর নর॥
হাস্য করি কয় মম যুদ্ধ যোগ্য নয়।
তথাচ আইসাছে যুদ্ধে জাইবারে হয়॥
এত বোলি ধনুর্ব্বাণ লইয়া বাহিরায়।
সন্ধানে সহস্র বাণ সৈন্যমুখে ধায়॥
জাহার যথায় বাস তথায় রাখিল।
হনুমানে কদলী কাননে পাঠাইল।
কিস্কিন্ধায় সুগ্রীব অঙ্গদ কবিগণে॥
লঙ্কায় রাখিল বাণ বীর বিভীষণে।
যথা জার কুটীর পাঠাইল মুনিগণে॥
অযোধ্যারে পাঠাইল রাজসেনাগণে।
রঘুনাথ লক্ষ্মণ থাকিলা মূর্চ্ছা হইয়া॥
জানকী ভাবয়ে রাম পার্শ্বেতে বসিয়া।
রাবণ সহস্র বাহু জাইয়া নিজঘর॥
পূজয়ে অভয়াপদ চিন্তিয়া অন্তর।
সীতা মনে ভাবি মূর্ত্তি হইলা অসিতা॥
চতুর্ভূজ অভয়া বরদা মুণ্ডকাতা।
করালবদনা মুক্তকেশী উলঙ্গিনী॥
চতুর্দ্দিকে উপনীত চৌষট্টি যোগিণী।
হান হান করে নাচে সভে দিগম্বরা।
অট্ট অট্ট হাস্য ভাস্য অতি ভয়ঙ্করা॥
ঘণ্টাধ্বনি ক'রে করে হুহুঙ্কার শব্দ।
শুনিয়া দানব ডরে ত্রিভুবন স্তব্ধ॥
শুনিয়া ঘণ্টার ধ্বনি রাজা চমকিত।
পুণরায় কেবা আইল এই বিপরীত॥
কেহু হউক জাইতে হইল করিবারে রণ।
তনয়ে ডাকিয়া আনি দিল সিংহাসন॥

সসৈন্যে সমরে রাজা গমন করিল।
বাহির হইয়া শ্যামা দেখিবারে পাইল॥
কয় মাতা কৃপা করি করহ উদ্ধার।
তোমার চরণ বিনে গতি নাই আর॥
অসিতা করিলা আজ্ঞা যোগিনী সকলে।
ভোজন করহ সৈন্য সভে ঋতুহলে॥
কাটি ঝাটি মুণ্ড সভে করয়ে ধারণ।
রুধিরের ধারা পানা সভার ভোজন॥
রাবণ সহস্র বাহু করিয়া ছেদন।
কটী বেড়া কৈল হইল করের ভূষণ॥
সমরে সকলে আশি নাচে সর্ব্বজনা।
আনন্দে করয়ে সভে রুধিরের পানা॥
সৈন্য শেষ হইল তবু নাই করে ক্ষমা।
নাচিলা চীকারি সভে ঘোররূপা শ্যামা॥
ধরাধর নড়ে পড়ে ধরণী অস্থির।
ধরিতে অনন্ত নারে অশক্ত শরীর॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা।
পয়ার প্রবন্ধে রাম গুণের বর্ণনা॥
ব্রহ্মার নিকট ধরা করয়ে আদাস।
রক্ষা কর প্রভু তব সৃষ্ট জায় নাশ॥
দেবগণ লইয়া ব্রহ্মা আইলা তথায়।
দেখেন সমরে নাচি অসিতা বেড়ায়॥
দেখে রঘুনাথ অচেতন রথপরি।
জাইয়া জাগায় বিধি পাদপদ্ম ধরি॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ উঠি না দেখেন সীতা।
চমকিত হইয়া উভয়ে চারি ভিতা॥
রাবণে লইয়া গেল সেই ভয় মনে।
একবার উদ্ধারিল অনেক যতনে॥
এবার লইল উদ্ধারের হেতু নাই।
চিন্তিত দেখিয়া বিধি কন তার ঠাঁই॥

অচেতনে ছিলা প্রভু না জান বারতা।
সম্মুখে দেখহ সীতা হইয়াছে অসিতা॥
করলাবদনা দিগম্বরী মুক্তকেশী।
সহস্র যোগিনী সঙ্গে নাচে কারে হাঁসি॥
পদভরে ডরে ধরা জায় রসাতল।
রক্ষা কর প্রভু সৃষ্ট তোমার সকল॥
শুনি রাম চমকিয়া দেখেন অসিতা।
লক্ষ্মণে কহেন এই না হয় বনিতা॥
সীতারে ভক্ষণ বুঝি করিয়াছে শ্যামা।
নাচি নাচি কারে ধরে নাহি দেখি ক্ষমা॥
সীতা হারাইল ভাই চলো দেশে জাই।
কহিব কি সভে আর জননীর ঠাঁই॥
লক্ষ্মণ কহেন আমি দেশে না জাইবো।
অসিতা চরণে জাইয়া পড়িয়া রহিবো॥
অসিতা সম্মুখে গেলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ধরিয়া দুজনে কৈলা কর্ণের ভূষণ॥
কোনু মতে ক্ষমা নাই ভাবয়ে বিধাতা।
হেন বেলে শম্ভুনাথ আইলেন তথা॥
বিধি হন কালী ক্ষমা তোমা হইতে হয়।
যে উচিত হয় তাহা কর মহাশয়॥
শুনি শম্ভুনাথ জাইয়া পড়িলা চরণে।
অসিতা চরণ বক্ষে ধরিলা জতনে॥
দক্ষিণ চরণ বক্ষে বাম উরু পরি।
হরে দেখি লজ্জিতা হইলা দিগম্বরী॥
সংবর অসিতা মূর্ত্তি কন ত্রিপুরারি।
ছাড়ি ঘোর মূর্ত্তি সীতা হইলা সুন্দরী॥
কর্ণ হইতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে ছাড়ি দিল।
লজ্জায় লজ্জিতা হইয়া ধরায় বসিল॥
নগ্না মগ্না হইয়া কৈল দুষ্টের দমন।
এবে লজ্জা নাই জাবো অযোধ্যা ভুবন॥

বিধি হর কন লজ্জারূপা দিগম্বরি।
বট তুমি সর্ব্বরূপা সর্ব্বরূপ ধরি॥
হইলা সুন্দরী এবে কি লজ্জা তোমার।
রঘুনাথ বাসা হইয়া বৈস পুনর্ব্বার॥
দরসন করিয়া জুড়ায় দুনয়ান।
প্রণাম করিয়া জাই অপনার স্থান॥
বিধি হর বাক্যে সীতা বামেতে বসিল।
লক্ষ্মণ লইয়া ছত্র মস্তকে ধরিল॥
বিধি হর স্তব করি হইলা বিদায়।
পুষ্পক বিমানে সীতারাম চড়ি জায়॥
অযোধ্যায় উপনীত হইলা শ্রীরাম।
দেখিয়া সকল লোক পূর্ণ পাইল কাম॥
সিংহাসনে বসিলেন বামে লক্ষ্মী সীতা।
লক্ষ্মণ সম্মুখে ধরিলেন স্বর্ণ ছাতা॥
পাশে ভরত শত্রুঘন তালবৃন্ত ধরে।
অগ্রে ব্যগ্র হনুমন্ত বহুস্তুতি করে॥
সুগ্রীব অঙ্গদ কপিগণ বিভীষণ।
সভায় বসিল সব অযোধ্যার গণ॥
ধর্ম্ম অবতার রাম ধর্ম্ম কর্ম্ম করে।
শরদে শারদী পূজা প্রতি ঘরে ঘরে॥
মুনিগণ আসি সপ্ত সাত পাঠ করে।
মহাপূজা করে রঘুনাথ নিজ ঘরে॥
বশিষ্ঠ পুরোধা বাক্য করে উচ্চারণ।
পূজক হইয়া রাম করয়ে পূজন॥
শিবযুক্ত নবমীতে করিয়া বোধন।
নিত্য নিত্য ভদ্রকালী করয়ে পূজন॥
অধিবাস ষষ্ঠী দিনে সায়াহ্নে করিল।
সপ্তমীর প্রাতে পত্রী প্রবেশ হইল॥
মহাষ্টমী দিনে মহা করিয়া পূজন।
সন্ধি পূজা কৈল হইয়া হরষিত মন॥

বহু বলি দিয়া মহা নবমী পূজন।
বিজয়া দশমী দিনে কৈল বিসর্জ্জন॥
এইরূপ প্রতিবর্ষ কৈল রাম পূজা।
দেখিয়া সেমত পূজা করে সব প্রজা॥
মহাসুখে রামচন্দ্র রাজ্যভোগ করে।
এগারো সহস্র বর্ষ অযোধ্যা নগরে॥
শস্যময়ী পৃথিবী আনন্দময় জন।
রচিল পয়ারে সত্য এই রামায়ণ॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া ভাবনা।
পৃথ্বীচন্দ্রে রচে গীত অপূর্ব্ব রচনা॥ ১৪॥
অনন্ত রামের লীলা অনন্ত বর্ণনা।
সাধ্যমত কবিগণ করয়ে রচনা॥
কল্পে কল্পে কত মত কৈল রাম লীলা।
জেবা জত জানিলেক করিতে রচিলা॥
চতুঃষষ্ঠী লক্ষ গ্রন্থ হইল রামায়ণ।
অমর নগরে সব থাকিল বর্ণন॥
পৃথিবীতে লক্ষ গ্রন্থ হইল প্রকাশ।
আদি কবি বাল্মীকের পুরে মন আশ॥
সকল পুরাণে ব্যাস করিলা রচনা।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে সার হইয়াছে বর্ণনা॥
স্মরণে পঠনে তনু পবিত্র নিতান্ত।
ভবার্ণবে পার সার অভয় কৃতান্ত॥
রামায়ণ স্মরণে জতেক পুণ্য হয়।
কহিতে না পারে কেহ করিয়া নির্ণয়॥
যদি ইচ্ছা ভবার্ণব হইবারে পার।
রাম রামায়ণ গ্রন্থ সদা কর সার॥
শ্রীরাম চরণ পদ্ম করিয়া বন্দন।
ভূপ পৃথ্বী চন্দ্রে রচে গীত রামায়ণ॥

ইতি সমাপ্ত।

সন ১২৩৯ সাল। তারিখ ১৭ই বৈশাখ।

দেবস্থান--কংকালিতলা।

এই শোক দুঃখ পরিপূর্ণ জ্বালাময় সংসারে, স্বর্গের জিনিস যদি কিছু থাকে, তবে তাহা দেবস্থান। তাপ-দগ্ধ হৃদয়ে অমৃত-প্রলেপ দিতে, ঘোর পাপান্ধকারে পুণ্যের তীব্র-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে, এমন বুঝি আর কিছুই নাই! মানব আত্ম-গ্লানির তীব্র কষাঘাতে ও অধর্ম্মের অসহ্য তাড়নায় নিষ্পেষিত হইয়া এবং ভবিতব্যের নৈরাশ্যপূর্ণ আলেখ্য প্রতি বিষণ্ণ হৃদয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া যতই ম্রিয়মাণ হউক না কেন, দেবস্থানে গমন করিলেই ক্ষণকালের জন্যও তাহার কঠোর তমসাচ্ছন্ন মলিন হৃদয় ধর্ম্মের শুভ্রালোকে উদ্ভাসিত হইবেই হইবে। দৈবী শক্তির পুণ্যময় আকর্ষণে মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মৃতকল্প প্রাণ অনুতাপের বৈদ্যুতিক প্রবাহে উদ্বেল হইয়া উঠিবেই উঠিবে। দেবস্থল পবিত্রতার বিলাসস্থল, দ্যুলোক ও ভূলোকের সন্ধিস্থল, প্রেমের রঙ্গস্থল ও ভক্তির জন্ম স্থল বলিয়াই প্রেমিক ভক্তের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে এবং যেন সেই মহান বিশ্ব-যন্ত্রের অযুত তার নিঃসৃত গম্ভীর ঝঙ্কারের সহিত মিলিত হইয়া এক অব্যক্ত বাঙ্মনোতীত একতানময় স্বর্গীয় সংগীতে সমগ্র জগৎকে প্রতিধ্বনিত, মুখরিত, রোমাঞ্চিত ও আন্দোলিত করিয়া তুলে। প্রেমিক ভক্ত যখন তাহার বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর নিঃসঙ্কোচ ভাবে চিত্ত স্থাপন করিয়া উদার ভগবৎ-প্রেম-পূরিত গদ গদ ভাবে দেব-মন্দিরের দিকে তাহার প্রেমাশ্রু-সিক্ত করুণ-নেত্র-যুগল ন্যস্ত করেন, তখন তাঁহার হৃদয় কি এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব ভাবের অমৃত-তরঙ্গে ওতঃপ্রোত হইতে থাকে। সে সময় ঐ ভক্তের অন্তঃকরণে ঐ অমৃত-সুখ-সম্ভোগ স্বপ্ন কি মায়া, কি মতিভ্রম, কি সুখ, কি দুঃখ, ইহার কোনটী সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা তিনিই জানেন, ভক্ত তাঁহার স্বচ্ছ হৃদয়দর্পণে সনাতন চিন্ময়ের সেই দিব্য মূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিয়া যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন, ভক্তির উচ্ছ্বাসে যেন সমগ্র জগতের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়। তাই বলিতেছি, দেবস্থানের মত পবিত্র শান্তি-পূর্ণ প্রাণারাম স্থান জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ধর্ম্মের অনুশাসনে পাপহৃদয় সংযত না হইতেও পারে, রাজার কঠোর শাসনের প্রতি উপেক্ষা করিয়া দুষ্ট মানব নিরুদ্বেগে কালযাপন করি-তেও পারে, বক্তার গভীর উপদেশের প্রতি বিরক্তি-সূচক মুখভঙ্গিও করিতে

পারে, নটের গভীর মর্ম্মস্পৃক্ করুণ আর্ত্তনাদ তাহার পাপ পরিপূর্ণ হৃদয়কন্দরকে ক্ষণকালের জন্য সন্তাড়িত না করিতেও পারে; কিন্তু দেবস্থান, যাহারা পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাদিগকেও নিজ মোহিনী শক্তি-প্রবাহে ক্ষণকালের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখে, হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরিত করিয়া দেয়। পরকাল আছে, ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী, পাপের বিভীষিকা কি ভয়ঙ্কর, ইত্যাদি মহতী বার্ত্তা যেন কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থল হইতে আসিয়া তাহার কর্ণপটহে আঘাত করে, সেই আঘাতে তাহার মর্ম্ম-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে; বেদ-ধর্ম্ম রহিত মানবও ক্ষণকালের জন্য জগৎ সংসার ভুলিয়া সেই ঈশ্বরের পদপ্রান্তের দিকে ধাবিত হয়। হে পরমেশ! পাপী যদি পাপের স্রোতে চিরদিনই ভাসিতে থাকে, তবে তোমার পবিত্র পুণ্যময় নামের সার্থকতা কি? পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্যই যেন দেবস্থলে তোমার উদার প্রীতি মানব উপভোগ করিয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিস্তার করে।

কিছু দিন পূর্ব্বে আমার জীবন একটী দেবস্থানের সংস্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল, সেই পুণ্য-ক্ষেত্রের সমগ্র ঐশ্বর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বর্ণন করিবার ভাষা আমার নাই, তবে যৎকিঞ্চিৎ যাহা সংগ্রহ করিতে পারিলাম, তাহাই যথাশক্তি লিপিবদ্ধ করিলাম।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত বোলপুর ষ্টেসনের ৫ মাইল উত্তর পূর্ব্বে সাধক-দিগের লীলাভূমি কংকালীতলা অবস্থিত। আমার আবাসস্থান কীর্ণাহার হইতে নয় মাইল ব্যবধান মাত্র। আমি আমার জনৈক আত্মীয় সমভিব্যাহারে সে দিন কংকালীতলা গমন করিয়াছিলাম। গ্রীষ্মকাল, বেলা অপরাহ্ন। সূর্য্য-দেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন, বোধ হইতেছে যেন দিবসাধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বর্ণময় নূপুর তাঁহার একটী চরণ হইতে দৈবাৎ খসিয়া পড়িতেছে। ঐ বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত দেব নূপুরের নির্ম্মাণ পারিপাট্য বশতঃ ঔজ্জ্বল্য এতই অধিক যে, দূর হইতে তাহার রন্ধ্র-দেশ অবলোকন হইতেছে না। একদিকে দেব তিষাম্পতি অস্ত যাইতেছেন, অপর দিকে দেব নিশাপতি উদিত হইয়া প্রকৃতির সহিত মানবদশার নিত্য সম্বন্ধের সূচনা করিয়া দিতেছেন।

প্রদোষে বালচন্দ্র-রঞ্জিত মেঘে স্থির হইয়া থাকাতে বোধ হইতেছে, দিন-মণির বিরহে যেন দিবসস্ত্রীর গণ্ডস্থল আরক্ত হস্ততলে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। লোহিতবর্ণ সূর্য্য-কিরণ, তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের উপর পতিত হওয়াতে যেন প্রকৃতি দেবীর কৌষেয় বসনাঞ্চল বলিয়া বোধ হইতেছে।

দেবী-মন্দিরের পাদতল বিধৌত করিয়া কোপাই নাম্নী সংকীর্ণা স্রোতস্বিনী "দেহি পদ-পল্লব মুদারম্" গাহিতে গাহিতে উত্তরাভিমুখে চলিয়া, কেহ না বলিয়া দিলেও স্থানটীকে পীঠস্থান বলিয়া অপরিচিতের বোধগম্য করিয়া দিতেছে। ক্রমে আমরা দেবীর মন্দিরের সমীপে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, প্রথমেই কয়েকটী ভ্রমর মুখরিত সহকার তরু অতিথিগণের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। ভৈরবী মাতার যত্নে নানা জাতীয় পুষ্প, সৌরভ বিস্তার করিয়া আশ্রমটীকে আমোদিত করিতেছে। একটী সদ্য সমাধি স্থান নয়নপথে পতিত হইল; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মায়ের জনৈক ভক্ত শ্যামানন্দ স্বামী নামক মহাপুরুষ ১১৩ বৎসর বয়সে সমাধিস্থ হইয়াছেন। পরে আমরা মায়ের মন্দিরে যাইয়া মাকে ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক তথায় উপবেশন করিলাম। দেবীর সেবাইত সারদাপ্রসাদ গোস্বামীর সহিত কিয়ৎক্ষণ আমাদের কথাবার্ত্তা হইল।

তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় জানিলাম, এখানকার জমিদার কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী রমানাথ ঘোষ। তাঁহার পত্তনিদার বোলপুর তালতরিয়া নিবাসী ৺ নোটনচন্দ্র ঘোষ। মায়ের সেবার জন্য বিস্তর জমি আছে। সারদাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী এখানে নয় বৎসর আছেন; তিনি পূর্ব্ববঙ্গ-নিবাসী। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। তিনি মায়ের নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য নিজ প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। কংকালীতলা ৫১টী পীঠের মধ্যে একটী পীঠ। এখানে মায়ের কটিদেশ (কাঁকাল) পতিত হইয়াছিল। এখানে রুরু নামে ভৈরব, কাঞ্চীশ্বর নামে শিব এবং রণরঘু নামে বিষ্ণু আছেন। দেবী কংকালী অপ্রকাশিতা,—নদীতীরস্থ একটী ক্ষুদ্র কুণ্ডের মধ্যে আছেন। সেই স্থানেই উদ্দেশে পূজা হইয়া থাকে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন পূজার বিপুল আয়োজন হয়, সেই দিন ভক্তগণের প্রদত্ত দুগ্ধ, গঙ্গোদক, নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য প্রভৃতিতে কুণ্ডের জল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয় ও সুমিষ্ট হইয়া থাকে। কাঞ্চীশ্বরের মন্দিরের বামভাগে একটী বিল্ব বৃক্ষ মূলে ২টী তৈলাক্ত শৃঙ্গ মদদৃপ্ত বৃষভ গিলিত চর্ব্বণ করিতেছে। সারদাপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর বুদ্ধিকৌশলে মায়ের ভাল ভাল জমিগুলিতে শস্যোৎপত্তির জন্যই ঐ বৃষভদ্বয় নিযুক্ত। সমাগত অতিথিগণের সেবা ও পরিচর্য্যা দেখিয়া ভৈরবী মাতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অনেকগুলি সন্ন্যাসী মন্দিরের প্রাঙ্গণে ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়া

আছেন। মঠাধ্যক্ষ স্বামীর গৃহটী দেখিলাম বেশ সুসজ্জিত; রাইটীং ডেস্ক, দোয়াত, কলমদান, নানাবিধ পুস্তক, নানাবিধ মাসিক সাপ্তাহিক ইংরেজী বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ইত্যাদিতে গৃহভ্যন্তরভাগটী "নস্থানং তিল ধারণং" হইয়া রহিয়াছে। ইহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। তিনি সুশিক্ষিত, মার্জ্জিত রুচি ও অতিথি সেবায় তৎপর, নিঃস্বার্থ পরোপকার ভিন্ন এই দূরদেশের নির্লোভ যুবক সন্ন্যাসীর অন্য কিছু কর্ম্ম নাই। স্বর্গ মর্ত্ত্য, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জরা মৃত্যু ইত্যাদি নানা বিষয়ের চিন্তা মনকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে, এমত সময়ে একটী সাধক সুদূর গগন-বিপ্লবকারী নিশীথ কালীন পাপিয়ার সংগীতের ন্যায় সাধকপ্রবর রাম প্রসাদের কয়েকটী গান গাহিয়া মনকে ভক্তিপ্রবণ করিয়া তুলিলেন। ধন্য রামপ্রসাদ! মায়ের প্রকৃত ভক্ত ভিন্ন এরূপ স্বর্গীয় সঙ্গীত আর কাহার হৃদয়ে উদিত হইতে পারে?

সেই সংগীত শ্রবণে শক্তিরূপিনীর মহাশক্তি আমার শিরায় শিরায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যেন আমার প্রাণহীন দেহে এক নব জীবনের অবতারণা করিল। পুণ্যের শুভ্র জ্যোতিতে পাপের কৃষ্ণ রেখা মুছিয়া গেল। জ্বালাময় সংসার-কণ্ডূতি হইতে যেন ক্ষণকালের জন্য অব্যাহতি পাইলাম। মনে হইল, যেন মায়ের পদতলে বসিয়া কেবল কাঁদি। আহা সে ভাবের বুঝি অভিব্যক্তি নাই। সেই এক দিন আর এই এক দিন। জীবনের মধ্যে সেই এক দিন, যে দিন সসীমের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে অসীমের মহাখেলা দেখিয়াছি, মাতৃ ঐশ্বর্য্যে যে পাপী পুণ্যবান সকল পুত্রই সমান অধিকারী, তাহা সেই এক দিন বুঝিয়াছি। সেই এক দিন যে দিন বিশ্বযন্ত্রের সহিত তিতন্ত্রী মিলাইয়া প্রাণ ভরিয়া গাহিয়াছি—

"মন তুই কাঙ্গালী কিসে—
তোর ঘরের ভিতর অমূল্য-ধন চিন্‌লিনা তা সর্ব্বনেশে।"

ধিক তোমায় নাস্তিক! ধর্ম্ম জগতে যদি কোনও নিষ্ঠুর জীব থাকে, তবে তাহা তুমি। সুকোমল ভাবের যদি ভয়ঙ্করী রাক্ষসী মূর্ত্তি থাকে, তবে তাহা তোমার হৃদয়েই আছে। ভক্তের সরস হৃদয়ে নীরস সত্যের বিষ ঢালিয়া দিবার জন্যই বুঝি তোমার জন্ম। ভক্ত তাঁহার হৃদয়-বৃন্দাবনে স্বর্গের ছবি প্রতিবিম্বিত দেখিয়া একটু আনন্দ লাভ করিবে, আর তুমি কে, যে তুমি কল্পনা বলিয়া অকারণ তাঁহার সেই সাধের বৃন্দাবনে আগুন লাগাইয়া দিবে? তুমি কে যে তুমি ভ্রান্তযুক্তির সম্মার্জ্জনী প্রহারে সাধকের হৃদয়মন্দির হইতে

তাঁহার সেই ভক্তিপূজিত নিত্য প্রাণারাম দিব্য মূর্ত্তিটীকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে ? এ ভাবের কি বুঝ তুমি নাস্তিক !

তুমি ত কোন ক্ষুদ্র জীব, কোটি-কল্প যুগযুগান্তর ধরিয়া এই গভীর রহস্য উদ্ভেদ করিবার জন্য জলের বুদ্ বুদ্ মত কতশত অনন্ত কাল সাগরে ভাসিল, আবার পরক্ষণেই কোথায় লীন হইয়া গেল, কে জানে ? এ মন্দাকিনীর সহিত হাস্য পরিহাস করিতে গিয়া ঐরাবতের ন্যায় অপদস্থ হইও না। যুক্তি-চঞ্চুপুট বিস্তার করিয়া ও বিশাল জলধির পরিমাণ নির্ণয় করিতে চাহিও না। তোমার কঠোর যুক্তি-কর-স্পর্শে ভাবের সুকুমার পুষ্প এখনই শুষ্ক হইয়া যাইবে। সমগ্র সুষমা বিনষ্ট হইবে। তাই বলি, যদি প্রেমের সাগরসঙ্গম দেখিতে চাও, হৃদয়-মরুতে গোলাপের সুষমা দেখিবার বাসনা কর, তবে ভক্তের দিব্য হৃদয়টী দু চারিদিনের জন্য ধার কর, যদি তাহা কিছু রসাস্বাদ করিতে পারে, ক্ষতি নাই, কিন্তু সাবধান ! দেখিও যেন তোমার চিরাভ্যস্ত ভ্রান্ত মত লইয়া ভক্ত হৃদয়ের সেই সুন্দর আলোক চিত্রন যন্ত্রটীকে বিকল করিয়া দিওনা।

মন্দির প্রদক্ষিণানন্তর মঠাধিস্বামীর সহিত আমরা বাহিরে আসিলাম। তিনি নানা কথা কহিতে কহিতে আমাদের সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিলেন, পরে সন্ধ্যার বন্দনাদির জন্য চলিয়া গেলেন।

আশ্রমের অভাবাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম যে, মায়ের কুণ্ডটী যদি বাঁধান হয় এবং মন্দিরটী যদি সংস্কার হয়, তাহা হইলেই তিনি কৃতার্থ। অন্ততঃ বীরভূম জেলাস্থ ভূম্যধিকারিগণের এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে যত্নকরা কর্ত্তব্য।

যে স্বপ্নের সাগরে এতক্ষণ ভাসিতেছিলাম, বাহিরে আসিয়া ক্ষণকাল পরেই সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। পাপের প্রাণ স্বর্গের ঐশ্বর্য্যে তৃপ্ত হইবে কেন ? সংসারের কর্কশ কোলাহলে অমরাবতীর সে বংশীধ্বনি ডুবিয়া গেল। ক্রমে আমরা নদীতীর অতিক্রম করিয়া বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলাম। স্বভাবের এমন মনোহর দৃশ্য যেন আর কখনও দেখি নাই। মন্দিরের অনতিদূরে নদীর নাতি প্রশস্ত বেলাভূমিতে একটী মনোরম সহকার-তরু-প্রধান বনস্থলী। যদিও সেস্থানে কৃষ্ণসার শৃঙ্গের দ্বারা মৃগীর নয়ন কণ্ডূয়ন করিতেছে না, সত্য, তথাপি ঘন নিবিষ্ট পাদপ শ্রেণী ও লতা-বিতানে স্থানটী আচ্ছন্ন থাকায় দর্শকের অন্তরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার কর।

আম্রাটবী মধ্যে স্থানে স্থানে সাম-গান-নিরত মুণ্ডিত-মস্তক ব্রাহ্মণ শিশুর ন্যায় পরিষ্কৃত ভূমি সকল দেখিয়া জনৈক কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলাম, এস্থান গুলি কি জন্য পরিষ্কৃত হইয়াছে ? জিজ্ঞাসা করায়, সে উত্তর করিল মহাশয় ! এস্থানে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন নিকটবর্ত্তী অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ মায়ের মেলা দর্শনার্থী যাত্রিগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া ফল, মূল, মিষ্টান্ন ও সুশীতল জল দ্বারা যথাবিহিতরূপে পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। সে দিন জনতা-বাহুল্য প্রযুক্ত জল সমল হয়, এজন্য তৎপূর্ব্বদিন সকলে যত্নপূর্ব্বক জল তুলিয়া নূতন মৃৎপাত্রে শীতল করিয়া রাখে। উদ্যানাভ্যন্তরে সূর্য্যালোক প্রবেশের অধিকার নাই ; নানাবিধ বনজ বৃক্ষের সমাবেশ থাকায় এস্থানে যেন চির বসন্ত বিরাজিত ; সমীরণ তরঙ্গিণীর স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করিয়া অবিরাম মায়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। "কুসুম-পরাগ-রেণু-বাসিত ভূষিত তনু" অলিকুল গুণ গুণ রবে মায়ের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। রাশীকৃত শিরীষ কুসুম স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে ; আর কি কুসুম-পেলবা শকুন্তলা জন্মিয়া এই সকল কুসুম সদয়ভাবে কর্ণে পরিধান করিবেন ? নানাবিধ লতা সদা তীরস্থ মুগ্ধা সাওতাল বালিকাগণকে দয়িতের কণ্ঠালিঙ্গন শিক্ষা দিবার জন্যই যেন সহকার তরু সকলকে বেষ্টন করিয়া উঠিয়াছে। তটভূমিতে শত শত বৃক্ষরাজি দণ্ডায়মান হইয়া যেন স্রোতস্বিনীর সেই কলতানময় অব্যক্ত সংগীত শ্রবণ করিতেছে। নদীও যেন সেই কুহুতান-মুখরিত বৃক্ষ-শ্রোতৃবর্গের একান্ত ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া তটভূমিতে তরঙ্গ শির আনত করিয়া কীর্ত্তনগায়কদিগের ন্যায় বিনীত অভিবাদনে তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেছে। মানব আমরা, আমরা সে গানের কি বুঝিব ! সে নীরব সংগীতের আবরণে যে কি মধুময়ভাব লুক্কায়িত আছে, তাহা সেই বিশ্বময়ই জানেন। আমরা স্তম্ভিত হৃদয়ে ক্ষণকাল নদীর সেই নীরব সঙ্গীত ও তরঙ্গ নিচয়ের কাতর মিনতি শ্রবণ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তরঙ্গিণীর শীকর-সংপৃক্ত বায়ুসেবন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলাম।

এই তীর্থটীর প্রত্যেক অণুপরমাণুই যেন কবিত্ব পূর্ণ। প্রকৃত দেবী এই স্থান তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্য-সম্ভার সুসজ্জিত করিয়া যেন কবি ও ভক্তগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। এখানে আসিলে কবির কল্পনা-সমুদ্রে উজান বহিতে থাকে ; ভাবের উৎস স্বতঃই খুলিয়া যায়। সভ্যতার অহমিকা, বিজ্ঞানের প্রহেলিকা, কিংবা দর্শনের কুহেলিকা এখানে নাই। এই

"মধুকর-নিকর-করম্বিত, কোকিল-কূজিত কুঞ্জ-কুটীরের" আকর্ষণ এতই পবিত্র যে, এখানে আসিলে কবি কেন, সকলেরই জীবন জড়তা ও মলিনতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই সৌম্য-সুন্দর শান্তশীতল, শিবময় সনাতন ভগবদ্ প্রেমের সাগর সঙ্গমের দিকে অগ্রসর হয়। *

শ্রীকুলদাপ্রসাদ সেন।

রঙ্গলাল বাবুর গান।

বিশ্বকোষ বৃহদ্ অভিধানের অনুষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১২৭৪ সালে ডাঁড়কা গ্রামে প্রেম সম্বন্ধে শত শত গান রচনা করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় সেই গানের খাতা হারাইয়া গিয়াছে। আজি সে সময়ের তাঁহার রচিত দুইটি গান লিখিয়া পাঠাই এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহের মত প্রচার করেন, সে সময়েরও তাঁহার রচিত একটি গান পাঠাইতেছি। যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন, আপনার বীরভূমিতে প্রকাশ করিবেন।

(১)

(ঠেকা)

অকূলে পারেরি অর্থ ছিল না হে ভক্তাধীন।
মন প্রাণ বাঁধা রাখি চরণ লইনু ঋণ।
এ ধারে না উদ্ধার পাব, মন প্রাণ না ফিরে নেব,
আমি ঋণের দায় বাঁধা রব তব পাশে চিরদিন।
এ ঋণে না আছে শান্তি, খাতকের পাতক নাস্তি,
রঙ্গলাল তাই ভাবিয়া পরিশোধে উদাসীন।

* বীরভূমে এমন অনেক দেবস্থান আছে। সেই গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ও তৎসংসৃষ্ট ঐতিহাসিক-তত্ত্ব যদি কেহ সংগ্রহ করিয়া পাঠান, আমরা সাদরে তাহা প্রকাশ করিব।

(২)

(একতালা)

চিন্তে নারিনু চিন্তা হ'লো সার।
জান্তে তোমারি তদন্ত হ'লো দিন অন্ত
অন্ত না পাইনু কিছু তার।
সখা সুজ্ঞান প্রদানে, রাখহে নিদানে,
ভ্রমে ঘুরাওয়না আর।
আমি হয়েছি তোমারি, তুমি প্রাণহরি
অন্তে হইও হে আমার।

(৩)

(আড়া খেমটা)

বেঁচে গেলুম ওলো দিদি একাদশীর দায়ে।
বিদ্যাসাগর দেবে নাকি, বিধবা রমণীর বিয়ে।
শাঁখা খাড়ু নড়বে হাতে, খেতে পাব মাছে ভাতে,
সাড়ি সিঁদুর্ পরে আবার বেড়াবো লো এয়ো হয়ে।
জামাই আস্‌বেন্ শ্বশুর বাড়ী, সাজ্ করিব তাড়াতাড়ি,
গা দুলিয়ে চল্‌বো আবার হরেক রকম্ বাহার দিয়ে।

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাভূষণ।

রাধা।

ওলো বিরহিনী ফিরে চল,
মিছে হেথা কাঁদিয়া কি ফল!
সেও লো গিয়েছে চলি' কঠোর চরণে দলি'
তোমার ও হৃদয় কোমল!
যমুনা বহিছে ধীরে, তোমার নয়ননীরে
তপ্ত আজি সে বারি শীতল;—
কত আর একাকিনী রবে হেথা, বিরহিনী,
হৃদে লয়ে দুঃসহ বেদনা!
কাজ নাই ফিরে চল, কেন এত দুঃখ বল,
কে সহে লো এহেন যাতনা!
ওই দেখ ছায়া ঢাকা কদম্বের ডালে
ময়ূরী নাচে না আর তালে তালে তালে,
কোকিল বকুলশাখে, কুহু কুহু নাহি ডাকে,
গুপ্ত থাকি' পাতার আড়ালে।
যমুনা নয়নজলে কেঁদে কলতানে চলে,
ঢেউগুলি দুঃখে ভেঙে যায়;
বাঁশরী বাজেনা আর, ফুরায়েছে রব তা'র,
ডাকে না সে "লো রাধিকা আয়"!

তা'রে নাহি জেনে শুনে দিয়াছিলে প্রাণ,
এখন রোদন্ বৃথা, বৃথা অভিমান!
চল সখি গৃহে যাই, কেঁদে আর কাজ নাই,
চেয়ে দেখ সন্ধ্যা আসে ঘিরে'।
ঘরে ফিরে গেল সবে, কেমনে একেলা রবে
বসি' আর যমুনার তীরে!

সই লো যাসনা আর বাঁশরী ডাকিলে তা'য়,
তা'র কথা ভাবিস্‌না মনে;
প্রভাতে ভুলিয়া যাস্ যদি তা'রে কাছে পাস্,
দেখা যদি হয় লো স্বপনে!

শ্রান্ত দেহ ভেঙে আসে আধ ঘুম ঘোরে,
হায়রে নিঠুর কালা কি কহিব তোরে!
সই মোর কথা শোন, শান্ত কর ক্লান্ত মন,
ঘরে চল কি কাজ হেথায়!
তুই এ যমুনাকূলে রয়েছিস সব ভুলে,
নিঠুর সে না জানি কোথায়!
তুই লো যূঁথিকা-মালা, তা'র লাগি ঝালাপালা
করিস্ না কোমল হৃদয়!
হেরি' ও মলিন মুখ সখি লো বিদরে বুক,
সরলার প্রাণে কত সয়!
সজনি লো,
লিখে রাখ হৃদিমাঝে আজি এ বসন্ত সাঁঝে
কালা অতি কঠিন নিদয়,
বুঝিয়াছি তাহার হৃদয়!

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কোন এক দ্বিজ ত্রিবিধ দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া সাংখ্যাচার্য্য মহর্ষি কপিলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরে নিজবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিল, "ভগবান্! ইহলোকে পরম যাথার্থ্য কি এবং কি করিলে কৃতকৃত্য হইতে পারা যায়।" মহর্ষি কপিল বলিলেন, "আচ্ছা কহিতেছি, শ্রবণ কর।" প্রকৃতি অষ্ট প্রকার যথাঃ—(১) অব্যক্ত, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার, ও পঞ্চ-তন্মাত্রা। অব্যক্তঃ—যাহা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় না? কেন হয় না? উঃ—আদিমধ্যান্ত বিহীন ও নিরবয়ব বলিয়া। "অনাদি মধ্যান্তত্বাৎ নিরয়বত্বাচ্চ"। উক্তঞ্চ"অশব্দমস্পর্শ সরূপমধ্যয়ং তথাচ নিতং রসগন্ধ বর্জ্জিতং। অনাদিমধ্যং মহতঃ পরং ধ্রুবং প্রধানমেতৎ প্রবদন্তি সূরয়ঃ॥ "বুদ্ধি" কাহাকে বলে? উঃ—অধ্যবসায়েরে নাম বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি অষ্টরূপাঃ—ধর্ম্ম,জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য অনৈশ্বর্য্য। ধর্ম্মঃ—শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান। জ্ঞানঃ—শব্দাদি বিষয়ে অপ্রবৃত্তি। বৈরাগ্যঃ—শব্দাদি বিষয়ে অনভিষঙ্গ। ঐশ্বর্য্যঃ—অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি। প্রথমোক্ত চারিটী সাত্বিক; আর শেষোক্ত চারিটী তামসিক। ধর্ম্মদ্বারা মানবের ঊর্দ্ধাগমন অর্থাৎ স্বর্গলাভ, জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ, বৈরাগ্য দ্বারা প্রকৃতিলয় এবং ঐশ্বর্য্য দ্বারা অপ্রতিহতগতিত্ব হয়। এই হইল অষ্টরূপা বুদ্ধি। অহঙ্কারঃ—অভিমানের নাম অহঙ্কার। "আমি শব্দ করিতেছি।" "আমি স্পর্শ করিতেছি," "আমি শত্রুহনন করিয়াছি" ইত্যাদিকে অহঙ্কার বলে। অহঙ্কার ত্রিবিধঃ—(১) বৈকারিক, (২) তৈজস, (৩) তামস। পঞ্চ-তন্মাত্রাঃ—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। প্রথমটী হইতে শব্দের, দ্বিতীয়টী হইতে স্পর্শের, তৃতীয়টী হইতে রূপের, চতুর্থটী হইতে রসের ও শেষোক্তটী হইতে গন্ধের উপলব্ধি হয়। শব্দ কয় প্রকার? উঃ—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, ষড়্জর্ষভ, গান্ধার,মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। স্পর্শ কয় প্রকার? উঃ—মৃদু, কঠিন, কর্কশ, পিচ্ছিল, শীত ও উষ্ণ। রস ছয় প্রকারঃ—কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর, অম্ল, ও লবণ। গন্ধ দুই প্রকারঃ—সুরভি ও অসুরভি। এখানে অষ্টপ্রকার প্রকৃতির কথা শেষ হইল।

"প্রকৃতি" শব্দের অর্থ কি? উঃ—প্রকৃষ্টরূপে সে সৃষ্টি করে। "প্রকুর্ব্বন্তি ইতি প্রকৃতয়ঃ।" বিকার ষোড়শ প্রকারঃ—একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত।

ইন্দ্রিয় দুই প্রকারঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এইগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে কেন? উঃ—স্ব স্ব কর্ম্ম করে বলিয়া। কোন্ ইন্দ্রিয়ের কি কার্য্য এখন পর্য্যালোচনা করা যাউক। শ্রোত্র দ্বারা আমরা শব্দ শ্রবণ করি। ত্বক্ দ্বারা আমরা স্পর্শ করি। চক্ষু দ্বারা আমরা বস্তুর রূপ দেখি। জিহ্বা দ্বারা আমরা রসের আস্বাদন করি এবং ঘ্রাণ দ্বারা আমরা গন্ধ অনুভব করি। বাক্ দ্বারা বাক্যোচ্চারণ, হস্ত দ্বারা আদান প্রদানাদি, পাদ দ্বারা বিহরণাদি, পায়ু দ্বারা মলাদির উৎসর্গ ও উপস্থ দ্বারা আনন্দানুভব হইয়া থাকে। মনঃ—উভয়াত্মক অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক ও কর্ম্মাত্মক উভয়ই বটে। পঞ্চভূতঃ—পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ। শব্দাদি পাঁচটী গুণ পৃথিবীতে বিদ্যামান আছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এই গুলি জলের গুণ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ এই তিনটী গুণ তেজের। শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটী বায়ুর গুণ। আকাশের গুণ কেবল শব্দ। পুরুষের লক্ষণ—অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্ব্বগত, চেতন, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, ক্ষেত্র-বিৎ ও অপ্রসবধর্ম্ম। কি হেতু অনাদি? উঃ—আদ্যন্তমধ্য নাই বলিয়া। কি হেতু সূক্ষ্ম? উ—নিরয়ব ও অতীন্দ্রিয় বলিয়া। কি হেতু সর্ব্বগত? উঃ—সকল ঘটে বিদ্যমান বলিয়া। কি হেতু চেতন? উঃ—সুখ, দুঃখ, মোহোপলব্ধি রূপিত বলিয়া। কি হেতু নির্গুণ? উঃ—সত্ব, রজ, তমঃ এই তিন গুণের অতীত বলিয়া। কি হেতু নিত্য? উঃ—অকৃতকত্ব ও অনুৎপাদকত্ব হেতু। কি হেতু অকর্ত্তা? উঃ—উদাসীন বলিয়া। কি হেতু ভোক্তা? উঃ—সুখ দুঃখ পরিজ্ঞান হেতু। কি হেতু ক্ষেত্রবিৎ? উঃ—গুণা-গুণ জানে বলিয়া। কি হেতু অপ্রসবধর্ম্ম? নির্জীবতার হেতু কিছুই উৎপাদন করে না বলিয়া। নিম্নলিখিত গুলি পুরুষের পর্য্যায়শব্দঃ—পুরুষ, আত্মা, পুমান্, জন্তু, জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, নর, সবি, ব্রহ্ম, অক্ষর, প্রাণী, কু, অজ, য়ঃ, কঃ, সঃ, এষঃ। এইগুলি পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব—অষ্ট প্রকৃতি ষোড়শ বিকার ও পুরুষ। পুরুষ এক নহে, পুরুষ বহু। সুখ, দুঃখ, মোহ, সংস্কার জন্ম, মরণ ইত্যাদির নানাত্ব হেতু পুরুষ বহু। যদি পুরুষ এক হয়, তবে একের বন্ধনে বা মুক্তিতে সকলের বন্ধন বা মুক্তি হয় না কেন? একের সুখে সকলের সুখানুভব হয় না কেন? একের দুঃখে সকলের দুঃখ হয় না কেন? একের মরণে সকলের মরণ হয় না কেন? এরূপ হইতে পারে

না। সুতরাং পুরুষ এক নহে, বহু। পুরুষ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে :—

"এষ এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥
সহি সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ।
শিব একো মহানাত্মা যেন সর্ব্বমিদম্ ততম্॥
একো যথাত্মা জগতি প্রকৃত্যা বহুধা কৃতঃ।
পৃথক্ বদন্তি চাত্মানং জ্ঞানাদেকঃ প্রবর্ত্ততে॥

ত্রৈগুণ্য কাহাকে বলে? উঃ—সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণকে ত্রৈগুণ্য বলে। সত্ব সুখাত্মক, রজঃ দুঃখাত্মক, আর তমঃ মোহাত্মক। এই হইল ত্রৈগুণ্যের ব্যাখা। সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চর কাহাকে বলে? উঃ—উৎপত্তিকে সঞ্চর এবং প্রলয়কে প্রতিসঞ্চর বলে। প্রতিসঞ্চর কি প্রকারে হয় দেখা যাউক। ভূত সকল তন্মাত্রায়, তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়গণ অহঙ্কারে, অহঙ্কার বুদ্ধিতে, বুদ্ধি অব্যক্ততে লীন হয়। কিন্তু অব্যক্ত কোথায়ও লীন হয় না। পঞ্চ অভিবুদ্ধি কি কি? উঃ—অভিবুদ্ধি, অভিমান, ইচ্ছা, কর্ত্তব্যতা ও ক্রিয়া। "এই কার্য্যটী করা উচিত" এই যে অধ্যবসায়, তাহার নাম বুদ্ধি ক্রিয়া। "আমি করিতেছি" এই ভাবকে অহঙ্কার ক্রিয়া বলে। ইচ্ছা শব্দের অর্থ বাঞ্ছা। সংকল্প মনের কার্য্য। শব্দাদি বিষয়ালোচন শ্রবণাদি লক্ষণ যুক্ত কর্ত্তব্যতা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া। পঞ্চ কর্ম্মযোনি :—ধৃতি, শ্রদ্ধা, সুখাদি বিবিদিষা অবিবিদিষা। শাস্ত্রে উক্ত আছে :—

"বাচি কর্ম্মাণি সংকল্পে প্রতিষ্ঠাং যোঽভিক্ষরতি
তন্নিষ্ঠস্তৎ প্রতিষ্ঠশ্চ ধৃতেরেতত্তু লক্ষণম্ ;
অনসূয়া ব্রহ্মচর্য্যম্ যজনম্ যাজনম্ তপঃ।
দানম্ প্রতিগ্রহো হোমঃ শ্রদ্ধায়া লক্ষণম্ মতম্॥
সুখার্থো যস্ত সেবেত বিদ্যাম্ কর্ম্ম তপাংসি চ।
প্রায়শ্চিত্তপরো নিত্যম্ সুখোঽয়ম্ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

পঞ্চ বায়ু কি কি? উঃ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। প্রাণবায়ু মুখ নাসাতে, অপান পায়ুতে, সমান নাভিতে, উদান কণ্ঠেতে, আর ব্যান সর্ব্ব নাড়িতে অধিষ্ঠান করে। পঞ্চ কর্ম্মাত্মা :—বৈকারিক, তৈজস,

ভূতাদি, সানুমান, ও নিরনুমান। বৈকারিক শুভ কর্ম্মের কর্ত্তা। তৈজস অশুভ কর্ম্মের কর্ত্তা। ভূতাদি মূঢ় কর্ম্মের কর্ত্তা। সানুমান শুভ মূঢ়কর্ম্মের কর্ত্তা। নিরনুমান শুভামূঢ় কর্ম্মের কর্ত্তা। পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা কি কি? উ :—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিশ্র, অন্ধতামিশ্র। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটী অনাদিতত্ত্ব। পুরুষ নির্গুণ, চেতন, বহু ও বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। প্রকৃতি অচেতন, বিভু, এক ও পরিণাম স্বভাব। পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হয়। উপাদান (সমবায়ী) কারণ অর্থাৎ অবয়বদ্রব্যের গুণ অনুসারেই কার্য্যদ্রব্যে গুণ জন্মে। অতএব কার্য্যের গুণ দেখিয়া কারণের গুণ কল্পনা করা যাইতে পারে। সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত সত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিন গুণের নাম প্রকৃতি। অবয়বের বিভাগ হইতে যেখানে শেষ হয়, আর বিভাগ চলেনা, তাহারই নাম মূলকারণ প্রকৃতি। নৈয়ায়িক পরমাণুতে বিশ্রাম স্বীকার করেন, পরমাণু নিরবয়ব ও নিত্য। সাংখ্যকার আরও সূক্ষ্মতম অবস্থায় উপনীত হইয়া বিশ্রাম করিয়াছেন। সাংখ্যের তন্মাত্র ও ন্যায়ের পরমাণু একস্থানীয় হইতে পারে, প্রভেদ এই, পরমাণু নিত্য, তন্মাত্র জন্য। সাংখ্যমতে অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই। অনভিব্যক্ত অবস্থায় কার্য্যবর্গ প্রলয়কালে প্রকৃতিতে থাকে, সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন বা আবির্ভূত হয়, এই মতে আবির্ভাবের নাম উৎপত্তি এবং তিরোভাবের নাম বিনাশ। অদৃষ্টবশতঃ পুরুষের সন্নিধান বিশেষে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হয়। সাংখ্যমতে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে ঈশ্বরের অঙ্গীকার নাই। জন্যেশ্বর স্বীকার আছে, অর্থাৎ জীবগণই তপস্যা-বলে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই ব্যাপক হইলেও সৃষ্টির পূর্ব্বে উহাদের সংযোগ বিশেষ, প্রকৃতিভোগ্য হয়, আর পুরুষ ভোক্তা হয়। প্রকৃতি-পুরুষের উক্ত সম্বন্ধরূপ সংযোগ হইতেই সৃষ্টি হয়। প্রলয়কালে গুণত্রয় সমভাবে থাকে, কেহ কাহাকে অভিভব করে না। সুখ, দুঃখ, মোহ স্বভাব গুণত্রয় পরস্পর বিরোধ পরিহার করিয়া মিত্রভাবে অবস্থান করে। পুরুষের সংযোগ বিশেষ হইলে গুণত্রয়ের আর সে ভাব থাকে না, তখন তারতম্য ঘটে, এক অপরকে অভিভব করে। এইরূপে গুণত্রয়ের বৈষম্য অবস্থায় সৃষ্টি হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীশশিভূষণ রায় বি, এ।

আত্মসমর্পণ।

এ অনন্ত বিশ্বমাঝে
একাকী পড়িয়া আমি,
সভয়ে ডাকিছি তোমা,
'কোথা হে প্রাণের স্বামি!'
কোটি চন্দ্র, কোটি সূর্য্য,
কোটি গ্রহ, কোটি তারা—
অনন্ত সৃষ্টির যাঁর
ক্ষুদ্রতম বিন্দুপারা।
ফুৎকারে অনন্ত সৃষ্টি,
ফুৎকারে নিমেষে লয়,
কি মহান্ সেই স্রষ্টা,
কি অসীম শক্তিময়!
কোটি রবি, শশী তারা
যদিরে বিলীন হয়,
তথাপি সৃষ্টির যাঁর
হ্রাস বৃদ্ধি না ঘটয়;
এ হেন অনন্ত মাঝে
একাকী পড়িয়া আমি,
ভয়ে কাঁপি থর থর,
কোথা বিভো! কোথা তুমি!
এ বিপুল সৃষ্টি মাঝে
পৃথিবী রেণুর কণা,
কোথায় আমার স্থিতি!
আমি তবে কোন্ জনা!
অনন্ত বিশ্বের সনে
তুলিত হইলে হায়!
কেবা আমি খুঁজিলেও
কিছু নাহি পাওয়া যায়।
কে আমি কোথায় পড়ি
বিস্ময়ে পূরিত মন,
কে সে আমি মহা দম্ভে
করি সদা বিচরণ!
মৎকুণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র
এ বিশ্ব ভূতলে আমি,
আমি তবে কোন্ জন
বলহে জগৎস্বামি!

ঝঞ্ঝাবাতে ধূলিকণা
যেমতি চালিত হয়,
নাহি তার শক্তি কিছু
যথা রাখ তথা রয়।
হে প্রভো! হে বিশ্বপতে!
হে অনন্ত বিশ্বময়,
আমিও তেমতি বিশ্বে
নাহি ইথে সংশয়।
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি—
তাহার হতেও হীন,
কীট আমি, ধূলি আমি,
না, না—তা হতেও দীন!
কিবা আমি, কোথা আমি,
কত তুচ্ছ শক্তি মোর,
আকুল ব্যাকুল প্রাণ
এযে দেখি মহাঘোর!
আমিই কিছুই নহি,
আমার ক্ষমতা কিবা;
সূর্য্যই অস্তিত্ব শূন্য,
দিবসের কোথা বিভা?
পৃথিবী রেণুর কণা—
আমি তবে কোথা নাথ!
কিবা মম উপাসনা—
কিবা মম প্রণিপাত!
কি উদ্যম, কি সাহস,
কিবা চেষ্টা, কিবা যত্ন;
কি উন্নতি, কি পতন,
কিবা ধূলি, কিবা রত্ন!
কি জীবন, কি মরণ,
কি বিষাদ, কি হরষ;
কি মূর্খতা, কি পাণ্ডিত্য,
কি সরস, কি নীরস!
কিবা সুখ, কিবা দুখ,
কিবা হাসি, কিবা কান্না;
কিবা পাপ, কিবা পুণ্য,

কিছু নয়—কিছু নয়,
সব মাটী—সব ছাই!
আমার অস্তিত্ব কোথা
খুঁজিয়াত নাহি পাই!
টুটিয়াছে মোহ ফাঁস,
ফুরায়েছে অহঙ্কার,
আমিত কিছুই নহি,
তুমি মাত্র সারাৎসার।
আদি তুমি, অন্ত তুমি,
তুমি সর্ব্ব, তুমি নিত্য,
তুমি শক্তি, তুমি স্থায়ী
অক্ষর, অব্যয় সত্য।
চিরকাল আছ তুমি,
চিরকাল রবে তুমি,
ক্ষণেকে জনম মোর
ক্ষণেকে লুকাব আমি।
কলের পুতুল আমি,
যা করাও তাই করি,
যা বলাও তাই বলি,
যা ধরাও তাই ধরি!
হাসি কাঁদি—যাহা কিছু,
সকলি তোমারি খেলা;
মূলে আমি কিছু নই,
সকলি তোমার লীলা!
হে অনাদি, হে অনন্ত,
বিশ্বরূপ বিশ্বপতি!
যাহা ইচ্ছা—তাহা কর,
রাখ, মার—যাহে মতি।
ক্ষুদ্র আমি, হীন আমি,
অতি তুচ্ছ ভস্ম ছাই;
কি যাচিব তব পাশে
যাচার সাহস নাই।
সকলি তোমার ইচ্ছা,
সকলি তোমারি নাথ!
ভস্ম আমি—কি যাচিব!

কোটি সূর্য্য, কোটি চন্দ্র—
তব ভয়ে কম্পবান;
কি যাচিব তব পাশে,
ভয়ে কাঁপে এ পরাণ!
কীটের চরণ-ধূলি
এ বিশ্ব ভূতলে আমি,
অনন্ত অসীম সৃষ্টি
তুমি তাঁর স্রষ্টা স্বামী।
সর্ব্বশক্তিমান তুমি,
তোমাতে নিহিত সব,
আমাতে কিছুই নাহি,
আমি যে জড়ের শব।
কিছুই জানিনা আমি,
কিবা আমি—কোথা বাস,
কেন বা সৃজিলে মোরে,
কিবা তব অভিলাষ।
কোথা হতে কোথা তুমি
আনিয়া ফেলেছ হায়!
আবার ফেলিবে কোথা,
ত্রাসে কাঁপে এ হৃদয়!
শক্তিহীন, বলহীন,
আমি দীন নিরুপায়;
যাহা ইচ্ছা—তাহা কর,
সব তব শোভা পায়।
কালের সাগরে আমি
ক্ষুদ্র বুদ্বুদের প্রায়,
আমার আমিত্ব কিবা
কিছুই না বুঝি হায়!
কি উদ্দেশ্যে সৃজিয়াছ,
আমি কিছু জ্ঞাত নই;
ক্ষুদ্রতা হেরিয়া মম
নিয়ত স্তম্ভিত রই।
বিফল বাসনা মম,
বিফল সে অভিলাষ;
আমারি অস্তিত্ব নাই,

যাহে তুমি সুখী হও,
তাই তুমি কর নাথ !
তুমি হে বিশ্বের পতি
করি কোটি প্রণিপাত !
ইচ্ছা হয় সুখী কর,
ইচ্ছা হয় কর দুখী ;
যাহে তুমি সুখী হও,
তাহাতেই আমি সুখী।
যাহা করিবার দাও
তাহাই করিব আমি ;
যে আদেশ কর তুমি,
তাহাই পালিব আমি।
নাহিক আপত্তি কিছু,
নাহি মম অভিলাষ ;
তোমারি—তোমারি শুধু
পূর্ণ হৌক্ অভিলাষ।
হও বা না হও তুমি
আমার, হে ভবধব ;
জানিতে চাহি না তাহা,
আমি কিন্তু সদা তব।
তোমারি, তোমারি আমি—
তোমা ছাড়া কোথা যাই ;
তুমি আদি, তুমি অন্ত,
তোমা ছাড়া কিছু নাই।

দাও দুঃখ, দাও তাপ,
দাও জ্বালা, দাও কষ্ট,
দাও শোক, দাও রোগ,
তুমি যাহা বুঝ ইষ্ট।
দুখে যদি সুখী হও,
দাও তবে—দাও দুখ,
আনন্দে সহিব তাহা,
কভু না হব বিমুখ।
ক্রীড়ার পুত্তলি আমি,
কিবা মম অধিকার ;
সকলি তোমার সাধ্য—
তুমি শক্তি-মূলাধার।
যাহা ইচ্ছা তাহা কর,
তুমি অখিলের নাথ ;
আমি তব পদযুগে
করি কোটি প্রণিপাত।
আমি তো কিছুই নহি,
এ বিপুল বিশ্বতলে ;
তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা
পূর্ণ হৌক কালে কালে।
আমার আমিত্ব আর
নাহি কিছু মম মনে ;
তোমারি বাসনা নাথ !
পূর্ণ হৌক এ জীবনে।

শ্রীসৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী।